লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৮ বর্ষ | ৮ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ কার্তিক, ১৪২২ বঙ্গাব্দ | ১৭ মহররম, ১৪৩৭ হিজরি | ৩১ ইখা, ১৩৯৪ হি. শা. | ৩১ অক্টোবর, ২০১৫ ঈসাব্দ

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

সম্প্রতি ডাচ ন্যাশনাল পার্লামেন্টে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন

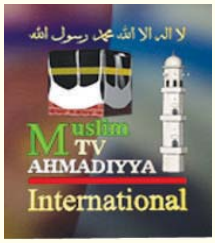

mta
INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময় সূচি

১। শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং রাত ৩.০০।

২। শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

৩। রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

৩। বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

এছাড়া বাংলাদেশের অনুষ্ঠান দেখুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন রাত ৮.০০-৯.০০ পর্যন্ত।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা **হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)** রচিত **'আল্ ইস্তিফতা'** পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহাদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

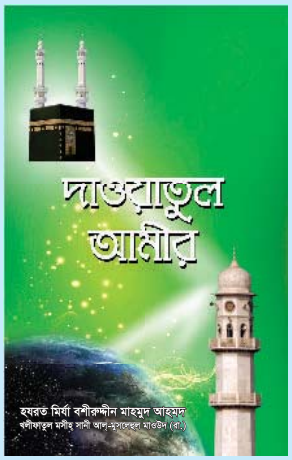

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) রচিত **'দাওয়াতুল আমীর'**-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

৩১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির **মূল্য ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

"Best Water, Best Life"

House hold/Official | Commercial/Industrial | Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

রহমান খোদার প্রিয় লোকদের অন্যতম ছিলেন হযরত আলী (রা.)

হযরত আলী (রা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, "রহমান খোদার দৃষ্টিতে সবচেয়ে প্রিয় লোকদের মাঝে হযরত আলী (রা.) ছিলেন একজন অতি বিশুদ্ধচিত্ত খোদাভীরু মানুষ, সর্বোৎকৃষ্ট যুগের নেতৃস্থানীয় মানুষ ছিলেন তিনি, প্রবল শক্তিধর খোদার বিজয়ী- সিংহ, স্নেহশীল খোদার বীর যুবক, দানশীল, পবিত্র হৃদয় এবং এমন অসাধারণ সাহসী যে, গোটা শত্রুবাহিনী তাঁর মুখোমুখি হলেও রণাঙ্গণই হতো তাঁর অবস্থানের কেন্দ্রস্থল। সারাটা জীবন তিনি কষ্টদায়ক অবস্থার ভেতর কাটিয়েছেন। নিজ যুগে মানুষের জন্য নির্ধারিত তাকওয়ার উচ্চমার্গে তিনি উপনীত ছিলেন। খোদার পথে ধনসম্পদ খরচ, মানুষের কষ্ট লাঘব, এতীম-মিসকীন ও প্রতিবেশীদের দেখাশুনা করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সবার আগে। যুদ্ধে তিনি বহুমুখী বীরত্ব প্রদর্শন করতেন।

একই সাথে তিনি ছিলেন মিষ্টভাষী ও বাগ্মী। তাঁর বক্তৃতায় তিনি মানব-হৃদয়ের গভীরে প্রবিষ্ট করিয়ে মনের মরিচা দূর করতেন। নিজ বক্তৃতার দিগন্তকে যুক্তির জ্যোতিতে তিনি আলোকিত করতেন। বিভিন্নমুখী কাজে তিনি ছিলেন অসাধারণ পারদর্শী। এসব বিষয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ ব্যক্তিকে পরাজিতের ন্যায় তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে হতো। সব কল্যাণময় কাজ, বক্তব্যের গভীরতা ও বাগ্মিতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উত্তম-আদর্শ। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে যে অস্বীকার করে, সে নির্লজ্জতার পথ অবলম্বন করে। নিরুপায় লোকদের প্রতি সহমর্মিতায় তিনি অশ্রু বিসর্জন দিতেন এবং স্বল্প-তুষ্ট মানুষ ও নিঃস্বদের খাবারের ব্যবস্থা করতেন। তিনি ছিলেন খোদার একজন নৈকট্য-প্রাপ্ত বান্দা। এর পাশাপাশি তিনি ছিলেন কুরআনের জ্ঞান আহরণকারীদের মধ্যে একজন শীর্ষস্থানীয় মানুষ। কুরআনের সুক্ষ্ম জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁকে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দান করা হয়েছিল। আমি তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় নয় বরং জাগ্রত অবস্থায় কাশফে দেখেছি। তিনি আমাকে সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি তফসীর তুলে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "এটি আমার তফসীর। এখন আপনাকে এর উত্তরাধিকারী করা হলো। আপনাকে যা দেয়া হয়েছে এর জন্য মোবারকবাদ জানাচ্ছি।" আমি হাত বাড়িয়ে তফসীরটি গ্রহণ করলাম এবং দানশীল ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। (পুস্তক 'সিররুল খিলাফাহ' বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ৫১-৫২)।

হযরত আলী (রা.)-এর পুত্র, হযরত ইমাম হোসেন (রা.) অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে কারবালা প্রান্তরে চক্রান্তকারী ইয়াজিদ বাহিনীর কাছে মাথানত না করে পবিত্র মহররম মাসের ১০ তারিখে যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেছিলেন। হযরত ইমাম হোসেন (রা.) সেদিন ন্যায় ও সত্যের মানদণ্ড সমুন্নত রাখতে চরম আত্মত্যাগের যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, তা সর্বকালে অনুকরণীয়, তবে শিয়ারা হযরত ইমাম হোসেন (রা.)-এর শাহাদতের স্মরণে শোক প্রকাশের নামে যে মাতম করে, তা আবেগ-তাড়িত অমূলক কাজ। শহীদে কারবালায় হযরত ইমাম হোসেন (রা.) বলেছিলেন- **'আমি শহীদ হলে তোমরা আমার জন্য উহ্! আহ্! করো না, আঁচল ছিঁড়ো না, বরং ধৈর্য ধারণ করে থাকবে'**। নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি, হযরত ইমাম হোসেন (রা.) খিলাফতে রাশেদার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য নিজ দেহের শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত দান করে গেছেন। যুগ যুগ ধরে তাঁর এই ত্যাগ মুসলিম উম্মাহকে খিলাফতে রাশেদার অনুরূপ আল্লাহ্ মনোনীত খলীফা ও ঐশী ইমামত-এর ছত্র-ছায়ায় জীবন অতিবাহিত করার অনুপ্রেরণা জোগাবে।

হোসেনী দালানে হতাহতের ঘটনায় পরিবারবর্গকে জানাই সমবেদনা

এই মহররমে গত ২৩ অক্টোবর রাজধানীর পুরান ঢাকার হোসেনী দালান এলাকায় শুক্রবার গভীর রাতে তাজিয়া মিছিলের প্রস্তুতিকালে সন্ত্রাসী বোমা হামলায় প্রাণহানি ও আহতের ঘটনায় আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। হতাহতদের প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক সহমর্মিতা। আল্লাহ্ তা'লা ব্যথাহত সকলকে ধৈর্যধারণের তৌফিক দিন ও তাদের প্রতি রহম করুন।

সূচিপত্র

৩১ অক্টোবর, ২০১৫

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

'বারাহীনে আহমদীয়া'
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ৬

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক নেদারল্যান্ডের নুনস্পিটস্থ মসজিদ বাইতুন নূর-এ প্রদত্ত ৯ অক্টোবর, ২০১৫-এর **জুমুআর খুতবা**। ৯

আল্ ইস্তিফতা (বিবেকের কাছে প্রশ্ন) ১৬
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৫-এর **জুমুআর খুতবা**। ১৯

কলমের জিহাদ ২৮
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

'ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না' ৩০
মাহমুদ আহমদ সুমন

তবলীগ ও তার পদ্ধতি ৩৩
খন্দকার আজমল হক

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর হাতে বয়আত করা জরুরী ৩৫
মৌ. এনামুল হক রনি

পৃথিবীতে একমাত্র আহমদীরাই সংঘবদ্ধ ৩৭
মোহাম্মদ আতা এলাহী শুভ

মহান আল্লাহ্‌র কাছে আমরা কৃতজ্ঞ ৩৮
আকমাল হোসেন মনির, রংপুর

পাঠক কলাম– ৩৯
"একজন আহমদী মুসলমান হিসাবে আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য।"
আনোয়ারা বেগম, মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, আবু সালেহ আহমদ

সংবাদ ৪২

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ ৪৫

PRESS RELEASE ৪৬

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক ৪৮

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন **'পাক্ষিক আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'পাক্ষিক আহমদী'** পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা আন্ নাহ্‌ল-১৬

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ
وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝٦

৬। আর গবাদি পশুও তিনি সৃষ্টি করেছেন। এগুলোতে তোমাদের জন্য রয়েছে উষ্ণতা এবং আরো অনেক অনেক উপকারিতা। আর এগুলোর কোন কোনটি তোমরা খেয়ে থাক।

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ
وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۝٧

৭। আর তোমরা যখন এগুলোকে চড়িয়ে গোধুলি লগ্নে ফিরিয়ে আন এবং (সকালে) তোমরা যখন এগুলোকে চরাবার জন্য ছেড়ে দাও তখন এর মাঝে তোমাদের জন্য থাকে এক মনোরম দৃশ্য।

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا
بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ
لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝٨

৮। আর এগুলো তোমাদের বোঝা বহন করে এমন সব দূরবর্তী জনপদে নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা চরম কষ্ট স্বীকার না করে পৌঁছুতে পারতে না। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক অতি মমতাশীল, বার বার কৃপাকারী।

وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا
وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٩

৯। আর (তিনি) ঘোড়া, খচ্চর, গাধা সৃষ্টি করেছেন যাতে করে এগুলোতে তোমরা আরোহণ করতে পার এবং এগুলো যেন তোমাদের শোভা বর্ধনের[১৫৩২] কারণও হয়। এ ছাড়া তিনি তোমাদের জন্য আরো যানবাহন সৃষ্টি করবেন যা তোমরা এখনো জান না[১৫৩২-ক]।

১৫৩২। আল্লাহ্ তা'লা যখন মানবের দৈহিক এবং পার্থিব প্রয়োজনের উপকরণ সরবরাহ করার জন্য এত যত্নবান, তখন এক মুহূর্তের জন্যও এ কথা চিন্তা করা যায় না যে, তিনি মানুষের আত্মার প্রয়োজনে অনুরূপ উপায় উপকরণ সরবরাহ না করে থাকতে পারেন, অথবা না তা উপেক্ষা করতে পারেন।

১৫৩২-ক। আয়াতের এ অংশটুকু ইঙ্গিত করে যে, মানবের জন্য আল্লাহ্ তা'লা এমন নতুন যানবাহনের অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটাবেন, যা তখন পর্যন্ত মানবের অজানা ছিল। আশ্চর্যরূপে এ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রতিফলিত হয়েছে রেলগাড়ী, জলযান, মটর গাড়ি, উড়োজাহাজ ইত্যাদি উদ্ভানের মধ্য দিয়ে। আল্লাহ্ তা'লাই কেবল জানেন, নতুন আরো কি কি যানবাহন ভবিষ্যতে মানুষের সুবিধার জন্য উদ্ভাবিত হবে, যা এখনো উদ্ভাবিত হয়নি।

হাদীস শরীফ

তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর

কুরআন :

'আর হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তওবা করে তাঁরই দিকে বিনীত হও। তিনি তোমাদের ওপর পর্যাপ্ত বর্ষণশীল মেঘমালা পাঠাবেন এবং তিনি তোমদের শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে থাকবেন। আর অপরাধে লিপ্ত হয়ে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিও না। (সূরা হূদ ঃ ৫৩)।

হাদীস :

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর এবং গুণাহ্‌র জন্য মাফ চাও; আমি এক দিনে একশত বার তওবা করি (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা :

মানুষ মাত্রই ভুল করে থাকে। এ ভুলের জন্যে অনেক সময়ে অনেক বড় মাশুল দিতে হয়। অনেক ভুলের সংশোধন নেই। যার ফলে অনেকে জীবনভর উহার মূল্য দিতে থাকে। আধ্যাত্মিক জগতের অবস্থাও অনুরূপ। মানুষ যেহেতু দুর্বল, সেহেতু সে ভুল করে। কিন্তু পৃথিবীতে ক'জন আছে, যে নিজেকে দুর্বল বলে আখ্যা দেয়? এমন লোক খুব কমই আছে।

ইসলাম মানুষকে সর্বদা উচ্চতর শ্রেণীতে উত্থিত করতে চেয়েছে। তাই ইসলাম মানুষকে ঐ সকল নির্দেশ দিয়েছে, যা তাকে উচ্চ আসনে সমাসীন করতে পারে। পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে আল্লাহ্ তা'লা তওবা করতে বলেছেন, ক্ষমা চাইতে বলেছেন। আধ্যাত্মিক জীবনে তওবা বা ক্ষমা চাওয়া ব্যতিরেকে উন্নতি করা সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন, যদি তোমরা তওবা কর তবে আমি তোমাদের সন্তান-সন্ততি, বৃষ্টি, ফসলাদি, দান করবো। অর্থাৎ এক কথায়, ক্ষমা চাওয়া একটি ফলদায়ক বৃক্ষ।

খোদার নিকট ক্ষমা চাওয়া শুধু যে গুনাহ্‌গারের জন্যেই, তা নয়। বরং সবাইকে চাইতে হবে। বলতে গেলে, ইস্তেগফার বা ক্ষমা না চাওয়া অহংকারের লক্ষণ। আর অহংকার এমন একটি পাপ, যা মানুষকে ধ্বংসের অতল-গহ্বরে নিক্ষেপ করে।

মহানবী (সা.) তাঁর উম্মতকে এভাবে নসীহত করেছেন, 'হে আমার উম্মত! তোমরা ইস্তেগফার কর। আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাও। তোমরা আমাকে দেখো। আমিও দিনে সত্তর বার খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি'। এখানে সত্তর অর্থ সত্তর নয় বরং অগণিত। হযরত নবী করীম (সা.)-এর মত নিষ্পাপ এবং আল্লাহ্‌র সবচেয়ে নৈকট্যপ্রাপ্ত সত্তা যদি দিনে অগণিত বার খোদার নিকট ক্ষমা চেয়ে থাকেন, তবে আমাদের অবস্থা কী হওয়া উচিত? আমরা তো পাপে নিমজ্জিত। আমাদের তো সর্বদা ইস্তেগফারে নিয়োজিত থাকা দরকার।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে যে শর্তে আমরা বয়আত হয়েছি, সেখানে এ শর্তটি রয়েছে যে, প্রত্যেহ নিজের পাপসমূহ ক্ষমার জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট প্রার্থনা করবে এবং নিয়মিত ইস্তেগফার পড়বে। ইস্তেগফার মানুষকে বিনয়ী করে তুলে, মানুষকে অহং হতে মুক্ত করে। তাই আসুন, আমরা হযরত নবী করীম (সা.)-এর নির্দেশানুযায়ী দৈনিক ইস্তেগফার করি ও খোদার আশীষের অধিকারী হই, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

মন্দ-স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিকে খোদা তা'লা কি সাহায্য করেন?

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

সুতরাং প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারে, খোদা কি কখনো এই রীতি গ্রহণ করেছেন এবং যখন হতে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তখন হতে তিনি কি কখনো এরূপ কাজ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি এরূপ মন্দ স্বভাববিশিষ্ট ধূর্ত, অশিষ্ট এবং খোদার নামে মিথ্যা কথা বলে এবং ত্রিশ বছর ধরে প্রতিদিন প্রতি রাত্রে খোদা তা'লার নামে মিথ্যা কথা বলে নিজের মনগড়া এক নতুন-ইলহাম বানিয়ে লোকদেরকে বলে বেড়ায় যে, খোদা তা'লার পক্ষ হতে এই ওহী অবতীর্ণ হয়েছে; আর খোদা তা'লা এরূপ ব্যক্তিকে ধ্বংস করার পরিবর্তে শক্তিশালী নিদর্শনাবলী দ্বারা তাকে সাহায্য করেন? তার দাবী সপ্রমাণ করার জন্য ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আকাশে চন্দ্র ও সূর্যে গ্রহণ লাগিয়ে দেন? অনুরূপভাবে যে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্বের কিতাবসমূহে, কুরআন শরীফে, হাদীসসমূহে এবং স্বয়ং তার কিতাব বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ ছিল, তা পূর্ণ করে জগদ্বাসীকে দেখান? এবং সত্যবাদীর ন্যায় ঠিক শতাব্দীর শিরোভাগে তাকে প্রেরণ করেন? এবং ঠিকই ক্রুশের প্রাধান্যের সময়, যেটাকে খণ্ডন করার জন্য ক্রুশ ধ্বংসকারী প্রতিশ্রুত মসীহের আগমন অবধারিত ছিল, তাকে এই দাবির সাথে দাঁড় করিয়ে দেন? এবং তার সমর্থনে দশ লক্ষের অধিক নিদর্শন দেখান? এবং পৃথিবীতে তাকে সম্মান প্রদান করেন? এবং পৃথিবীতে তার কবুলিয়ত বিস্তার করেন? এবং শত-শত ভবিষ্যদ্বাণী তার পক্ষে পূর্ণ করেন? এবং প্রতিশ্রুত মসীহের আবির্ভাবের জন্য নবীগণ কর্তৃক নির্ধারিত দিনে তাকে সৃষ্টি করেন? এবং তার দোয়া কবুল করেন? এবং তার বর্ণনায় প্রভাব সৃষ্টি করেন? একইভাবে তাকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন? অথচ তিনি জানেন, সে একজন মিথ্যাবাদী এবং অন্যায়ভাবে জেনে-বুঝে তাঁর প্রতি মিথ্যা ওহী আরোপ করে? তোমরা কি বলতে পার আমার পূর্বে খোদা তাআলা অন্য কোন মুফতারির (যে ব্যক্তি খোদার নামে মিথ্যা কথা বলে) প্রতি এরূপ দয়া ও করুণা প্রদর্শন করেছিলেন?

অতএব, হে খোদার বান্দারা! উদাসীন হয়ো না, যেন শয়তান তোমাদেরকে কুপ্ররোচণা না দেয়। নিশ্চিতভাবে জেনো, ঐ ওয়াদা পূর্ণ হল-যা আদি হতে খোদার পবিত্র নবীগণ করে আসছেন। খোদার প্রেরিত পুরুষগণ ও শয়তানের মধ্যে আজ শেষ-যুদ্ধ। এটি ঐ-সময় ও ঐ-যুগ, যার প্রতি দানিয়াল নবীও ইঙ্গিত করেছিলেন। আমি সত্যবাদীদের জন্য একটি আশিষরূপে এসেছি। কিন্তু আমাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা হয়েছে। আমাকে কাফের ও দাজ্জাল আখ্যা দেয়া হয়েছে। এরূপ হওয়াই জরুরী ছিল, যাতে এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে যায়, যা 'গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম' আয়াতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। কেননা, খোদা ***'মুনইম আলাইহিম'*** এর ওয়াদা করে এই আয়াতে বলেছেন' এই উম্মতের মধ্যে ঐসব ইহুদীও সৃষ্টি হবে, যারা ইহুদী-আলেমদের সদৃশ হবে। তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে ক্রুশে হত্যা করতে চেয়েছিল। তারা ঈসা (আ.)-কে কাফের, দাজ্জাল ও নাস্তিক আখ্যা দিয়েছিল। এখন চিন্তা কর, এটি কোন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। এটি এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত ছিল যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ এই উম্মতের মধ্য হতে আগমন করবেন। এজন্য তার যুগে ইহুদী-স্বভাববিশিষ্ট মানুষও সৃষ্টি হয়ে যাবে, যারা নিজেদের আলেম বলবে। অতএব আজ তোমাদের দেশে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে গেছে। এমন আলেম যদি না থাকত, তাহলে এই সময়- কাল পর্যন্ত এই দেশের সব মুসলমান অধিবাসী আমাকে গ্রহণ করত। সুতরাং সকল অস্বীকারকারীর পাপ এদের ঘাড়ে চাপবে। এরা ন্যায়পরায়ণতার প্রাসাদে না নিজেরা প্রবেশ করছে, না স্বল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন লোকদেরকে প্রবেশ করতে দিচ্ছে। এরা কতই না ষড়যন্ত্র করছে! এদের গৃহে সংগোপনে কতই-না শলা-পরামর্শ করা হচ্ছে। কিন্তু এরা কি খোদার ওপর জয়যুক্ত হয়ে যাবে? এরা কি সর্বশক্তিমান খোদার ইচ্ছায় বাদ সাধতে পারবে, যার সম্বন্ধে মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। এরা এই দেশের খল-প্রকৃতির আমীরদের এবং হতভাগ্য ঐশ্বর্যশালী বস্তুবাদী লোকদের ওপর ভরসা করছে। কিন্তু খোদার দৃষ্টিতে এরা কি? খোদার দৃষ্টিতে এরা মৃত কীট মাত্র।

['তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন' পুস্তক, বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৭৭-৭৯]

'বারাহীনে আহমদীয়া'

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

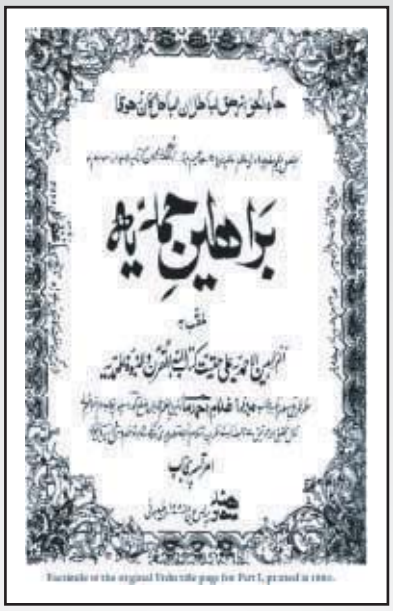

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

(৪র্থ কিস্তি)

ঘোষণা

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, পবিত্র কুরআন থেকে আমরা যে সকল যুক্তি ও সত্য প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছি, যারা এক্ষেত্রে স্বীয় গ্রন্থের সমকক্ষতা প্রমাণ করতে পারবে বা তাদের ঐশী গ্রন্থ যদি সে সকল প্রমাণ উপস্থাপনে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়, তাহলে নিদেনপক্ষে ব্যর্থতা স্বীকার করে আপন গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদের উপস্থাপিত যুক্তিকে যদি একে একে খন্ডন করতে পারে, তাহলে তাদেরকে দশ হাজার রূপিয়া পুরস্কার দেয়া হবে।

আমি, বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থের প্রণেতা, যারা ফুরকান মজীদ এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সত্যতায় অবিশ্বাসী, এমন সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের প্রতিদ্বন্দিতায়, সত্যের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে দশ হাজার রুপিয়া পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি সম্বলিত বিজ্ঞাপন প্রচার করছি। আমি এ মর্মে আইনানুগ এবং শরীয়তসম্মত সত্য অঙ্গীকার করছি যে, কুরআন মজীদ ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতা সম্পর্কে পবিত্র গ্রন্থ কুরআন থেকে আমরা যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপন করেছি, অস্বীকারকারীদের কেউ কুরআনের সাথে তুলনা করে স্বীয় ঐশী-গ্রন্থে (এর সত্যতার পক্ষে) এর সমপর্যায়ের প্রমাণাদি রয়েছে বলে প্রমাণ দিক, অথবা সম-সংখ্যক প্রমাণাদি উপস্থাপনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ বা এক পঞ্চমাংশ প্রমাণাদি উপস্থাপন করুক। কিন্তু তাও উপস্থাপনে যদি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়, তাহলে নিদেনপক্ষে আমাদের উপস্থাপিত যুক্তিগুলো একে একে খণ্ডন করে দেখাক। এসব শর্ত পূরণ সাপেক্ষে আমি ঘোষক, কোন ওজর-আপত্তি না করে আমার দশহাজার রুপিয়া মূল্যমানের সম্পত্তির দখলীসত্ব ও নিয়ন্ত্রণ উত্তরদাতার হাতে তুলে দেবো; শর্ত হলো, উভয় পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য তিন জন বিচারকের এ মর্মে সর্বসম্মত মতপ্রকাশ আবশ্যক হবে যে, শর্ত পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু স্মরণ থাকে, স্বীয় গ্রন্থ থেকে কেউ যৌক্তিক প্রমাণাদি উপস্থাপনে ব্যর্থ ও অপারগ হলে বা বিজ্ঞাপনের শর্তানুসারে একপঞ্চমাংশ প্রমাণাদি যদি উপস্থাপন করতে না পারে, তাহলে এটা স্পষ্টভাবে লিখে দিতে হবে, যে তাদের ঐশী-গ্রন্থ অযৌক্তিক ও অসম্পূর্ণ হওয়ার কারণে এ শর্ত পূরণে

ব্যর্থ হয়েছে। আর যদি কেউ অভীষ্ট প্রমাণাদি উপস্থাপন করে, তাহলে তাকে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, এক-পঞ্চমাংশ যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের সুযোগ ও ছাড় দেয়ার অর্থ এই নয় যে, কোন বাছ-বিচার ছাড়াই মোট প্রমাণাদির অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ বা এক-পঞ্চমাংশ উপস্থাপন করলেই চলবে, বরং এ শর্ত সকল শ্রেণীর প্রমাণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ সকল শ্রেণীর প্রমাণাদির মধ্য থেকে অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ বা এক-পঞ্চমাংশ প্রমাণাদি উপস্থাপন করতে হবে।

উল্লেখিত বাক্যে 'যুক্তি বা প্রমাণের শ্রেণী' বলতে কী বুঝায়– তা বুঝতে কোন ব্যক্তি হয়তোবা অপারগ হবেন। সুতরাং এ বাক্যের ব্যাখ্যায় লেখা হচ্ছে যে, কুরআন মজীদের যে সকল যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, এই বাণী সত্য আর হযরত মুহাম্মদ (সা.) খোদার সত্য রসূল–তা দু'ধরনের। প্রথমত: সে সকল প্রমাণাদি যা এই পবিত্র গ্রন্থ ও মহানবী (সা.)-এর সত্যতার অভ্যন্তরীন তথা ব্যক্তিগত সাক্ষ্য। অর্থাৎ এমন প্রমাণাদি, যা এই পবিত্র-গ্রন্থের নিজস্ব পরাকাষ্ঠা হিসেবে বিদ্যমান, আর যা স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র বৈশিষ্ট্য, সর্বজনপ্রিয় চরিত্র ও উৎকর্ষ গুণাবলী হতে প্রতীয়মান হয়।

দ্বিতীয়ত: সে সকল প্রমাণ যা আক্ষরিক অর্থে কুরআন শরীফ ও মহানবী (সা.) এর সত্যতার সুনিশ্চিত সাক্ষ্য অর্থাৎ এমন প্রমাণসমূহ যা বাস্তব ঘটনাবলী এবং প্রমাণিত ও পরম্পরাগত বিষয়াবলী থেকে নেয়া। অধিকন্তু এ উভয় শ্রেণীর প্রমাণাদির আবার দুটো প্রকার ভেদ রয়েছে, অর্থাৎ সরল ও যৌগ প্রমাণ। যে প্রমাণ কুরআনের ঐশী-গ্রন্থ হওয়া ও মহানবী (সা.)-এর সত্যতা প্রমাণের জন্য অন্য কোন বিষয়ের মুখাপেক্ষী নয়, সে প্রমাণই হলো সরল প্রমাণ। যৌগ প্রমাণ বলতে সে প্রমাণকে বুঝায়, যা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এমন সব পরস্পর আন্তঃনীর্ভরশীল যুক্তিসম্ভারের প্রয়োজন যে, যদি মোটের ওপর এটি বিবেচনা করা হয় আর সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর প্রতিটি অংশের প্রতি তাকানো হয়, তাহলে সামগ্রিক যুক্তি এত মহানরূপে প্রতিভাত হয়, যার আলোকে অবলীলায় পবিত্র কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু যদি এগুলোর প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথক ভাবে নেয়া হয়, তাহলে তা তত স্বচ্ছ ও স্পষ্ট যুক্তি বলে প্রতিভাত হয় না। এই অসামঞ্জস্যতার কারণ হলো পুরো অখণ্ড বিষয়ের মান ও মূল্য বিভিন্ন-বিচ্ছিন্ন টুকরোর সম্মিলিত মান ও মূল্য থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি ভারী জিনিস দশ ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে ওঠাতে সক্ষম, কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই যদি এককভাবে সেই বোঝা ওঠানোর চেষ্টা করে, তা সম্ভব হয় না। এই সরল ও যৌগ উভয় প্রমাণের প্রত্যেকটির বিশেষ রূপ, আকৃতি ও বাহ্যিক গঠনের নিরিখে এ পুস্তকে এর নাম রাখা হয়েছে 'প্রমাণের প্রকারভেদ'। ঘোষণা বা বিজ্ঞাপনের প্রথম দিকে আমরা এই প্রেক্ষাপটে শর্ত রেখেছিলাম যে, প্রতিদ্বন্দিতায় নামতে চায় এমন সকল ব্যক্তিকে, কুরআন যে সকল প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছে, স্বীয় গ্রন্থ থেকে তার সকল শ্রেণীর প্রমাণাদির এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ বা এক পঞ্চমাংশ যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। অর্থাৎ কোন এক শ্রেণিভূক্ত প্রতিটি প্রমাণের উত্তর দিতে যদি সে ব্যর্থ হয়, তবেই কেবল সে এটি করবে।

অধিকন্তু এখানে এ কথাও স্পষ্ট হওয়া উচিত, আমরা যেভাবে যৌগ-প্রমাণের সংজ্ঞা উপস্থাপন করেছি, কোন ব্যক্তি যদি নিজ গ্রন্থে এর দৃষ্টান্ত দেখাতে চায় তাহলে যে সকল উপ-প্রমাণের সমন্বয়ে সেই যৌগ প্রমাণ গঠিত; তাকে নিজ গ্রন্থ থেকে সে সব উপ-প্রমাণের প্রত্যেকটির একটি করে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে হবে, যার প্রত্যেকটি নিজগুণে বা স্বতন্ত্রভাবে কোন না কোন বিষয়ের একটি পরিপূর্ণ প্রমাণ হবে।

এই শর্তটি বুঝতে হলে যেহেতু দৃষ্টান্তের প্রয়োজন, তাই আমরা বহুবিধ প্রমাণাদির মধ্য হতে কুরআনের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে একটি যৌগ-প্রমাণ উপস্থাপন করবো। যেমন, কুরআনের মূল বা মৌলিক শিক্ষামালার ভিত্তি হলো যৌক্তিক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রমাণাদির ওপর। এভাবে বলা যায়, যেসব বিষয়ের ওপর মুক্তি নীর্ভরশীল, কুরআন করীমে বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত এমন সব মৌলিক নীতিকে গবেষকসুলভ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণ করে আর এর সত্যতাকে শক্তিশালী ও দর্শনভিত্তিক যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিশ্ব-স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করা, তাঁর তৌহীদ বা একত্ববাদের প্রমাণ দেয়া, ইলহামের আবশ্যকতা সম্পর্কে অখণ্ডনীয় প্রমাণাদি লিপিবদ্ধ করা আর সত্যকে সত্য প্রমাণে এবং কোন মিথ্যার অসারতা প্রমাণে ব্যর্থ না হওয়া। অতএব কুরআন করীম আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার এটি একটি শক্তিশালী প্রমাণ, যার মাধ্যমে এর সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কেননা, পৃথিবীর সব বিকৃত-বিশ্বাসকে সকল প্রকার ও সকল শ্রেণীর ভ্রান্তি থেকে স্পষ্ট প্রমাণাদির মাধ্যমে মুক্ত করা, মানব-হৃদয়ে বিরাজমান সকল প্রকার সন্দেহ ও সংশয়ের অকাট্য প্রমাণাদির মাধ্যমে নিরসন এবং যুক্তিপূর্ণ, প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত নীতির এমন সমাহার বা সংগ্রহ স্বীয় গ্রন্থে গ্রথিত করা, যা না পূর্বে কোন ঐশী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, আর না এমন কোন প্রাজ্ঞ ও দার্শনিকের সন্ধান লাভ হওয়া সম্ভব, যিনি স্বীয় চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা, বোধ-বুদ্ধি এবং জ্ঞান ও বুৎপত্তির জোরে কোন কালে এর প্রকৃত মর্মকথা উদঘাটনে সক্ষম হয়েছেন।

অধিকন্তু, কোন ভদ্রলোক কস্মিনকালেও এ মর্মে দুর্বলতম প্রমাণও দিতে পারেনি যে, মহানবী (সা.) আদৌ একদিন বা দিনের কিছু অংশ কোন স্কুল বা মক্তবে পড়েছেন, কিংবা কারো কাছে ধর্মের যৌক্তিক ব্যাখ্যা বা প্রচলিত জ্ঞান অর্জন করেছেন বা কখনও কোন দার্শনিক ও যুক্তিবিদের সাহচর্য পেয়েছেন এবং তাদের সাথে তাঁর মেলামেশা ছিল; যে কারণে হয়ত বলা যেতে পারতো যে, তিনি সকল সত্য-নীতি সম্পর্কে দর্শনগত যুক্তি উপস্থাপন করে মানুষের মুক্তি-সংক্রান্ত সকল বিশ্বাসের স্বরূপ এত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন, যার দৃষ্টান্ত ধরাপৃষ্ঠে কোথাও পাওয়া যায় না!

এটি এমন কাজ, যা ঐশী-সমর্থন ও খোদার ওহী ছাড়া কারো দ্বারা সাধিত হতে পারে না। সুতরাং দুর্বল ও অক্ষম যুক্তি-বুদ্ধি বা বিবেক একথা বলতে বাধ্য যে, কুরআন শরীফ সেই খোদার বাণী, যিনি এক এবং যার কোন শরীক বা সমকক্ষ নেই; জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন মানুষ তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না।

যৌগ প্রমাণাদির দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এই প্রমাণটি লিপিবদ্ধ করলাম, যা এমন উপাদানের সমাহার বা এমন সব উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত, যার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে এক একটি প্রমাণ বৈ-কিছু নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই প্রমাণের সব ক'টি উপাদান বা অংশ এমন যুক্তি বা প্রমাণ, যা সত্য-বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রতিদ্বন্দীর জন্য যেহেতু সকল প্রকার প্রমাণ উপস্থাপন করা আবশ্যক, তাই এই প্রমাণ উপস্থাপন করাও বাঞ্ছনীয় হবে, কেননা এই প্রমাণও বিভিন্ন প্রকারের প্রমাণাদির একটি প্রকারভেদ। কিন্তু এই প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য সেসকল যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপনও আবশ্যক যেসবের মাধ্যমে এটি গঠিত ও বিন্যস্ত এবং যেসবের সমন্বয়ে এটি অস্তিত্ব লাভ করবে। যেমন স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণে উপস্থাপিত যুক্তি, তাঁর একত্ববাদের পক্ষে প্রমাণ, তাঁর স্রষ্টা হওয়া বা সৃজনী-বৈশিষ্ট্যের অনুকূলে প্রমাণ দেয়া, ইত্যাদি; কেননা, এ সব উপ-প্রমাণ সেই প্রমাণেরই অংশ বা উপাদান। আর অস্তিত্ব বা সত্তার কোন অংশকে বাদ দিয়ে পুরো সত্তা বা অস্তিত্বের কথা ভাবাই যায় না, এবং উপাদান বা অংশকে বাদ দিয়ে পুরো বস্তুর অস্তিত্ব হতেই পারে না। তাই সকল আংশিক-প্রমাণ উপস্থাপন করাও প্রতিদ্বন্দীর জন্য আবশ্যক। অবশ্য যেখানে আমরা কোন নীতির সত্যায়নে পাঁচটি প্রমাণ দিয়েছি, প্রতিপক্ষ প্রত্যুত্তরে স্বীয় মতামত বা বিশ্বাস অনুসারে এর সত্যায়ন বা অপনোদনের নিমিত্তে, স্বীয় ঐশী-গ্রন্থ থেকে যদি কেবল একটি প্রমাণই উপস্থাপন করতে চায়, তাহলে এবিষয়ে তার স্বাধীনতা থাকবে; অবশ্য বিজ্ঞাপনে আমাদের উল্লেখিত শর্ত ও সীমারেখার মাঝে থেকে তা করতে হবে।

প্রচারক
অধম মির্যা গোলাম আহমদ
কাদিয়ান, গুরদাসপুর,
পাঞ্জাব।

ভাষান্তরঃ মওলানা ফিরোজ আলম
মুরব্বী সিলসিলাহ

(চলবে)

নারীদের মুখমন্ডল ঢেকে পর্দা করা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন-

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, "যারা বলে, ইসলামে মুখমন্ডল ঢাকার কোন আদেশ নেই আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করি, কুরআন করীম তো বলে, সৌন্দর্য গোপন রাখ। আর সবচেয়ে সৌন্দর্যের জিনিস হলো মুখমন্ডল। মুখমন্ডল ঢাকার যদি আদেশ না থাকে তাহলে সৌন্দর্য আর কি জিনিস যা ঢাকার জন্যে আদেশ দেয়া হয়েছে? নিঃসন্দেহে আমরা এ সীমা পর্যন্ত মানতে পারি, মুখমন্ডলকে এভাবে ঢাকা হোক যেন এর সুস্থতার ওপর কোন মন্দ প্রভাব না পড়ে, যেমন পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে নেয়া হয় অথবা আরবী মহিলাদের রীতি অনুযায়ী নিকাব বা ঘোমটা বানিয়ে নেয়া যায়, যাতে চোখ ও নাকের নথ যুক্ত থাকে। কিন্তু মুখমন্ডলকে পর্দার বাইরে রাখা যেতে পারে না।" (তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১০)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) পর্দার বিষয়টি পরিষ্কার করতে গিয়ে আরো বলেন– "কুরআন শরীফ থেকে প্রমাণিত ইসলাম সম্মত পর্দা হচ্ছে মহিলাদের চুল, গর্দান ও কানের আগা পর্যন্ত চেহারা বা মুখমন্ডল ঢেকে রাখা, এই আদেশ পালন করতে বিভিন্ন দেশে তাদের অবস্থা ও পোশাক অনুযায়ী পর্দা করা যেতে পারে।" (আল ফযল ৮ নভেম্বর, ১৯২৪)

জুমুআর খুতবা

একজন প্রকৃত আহমদীর বৈশিষ্ট

“দৈনন্দিন কার্যক্রমে অবৈধ বা অন্যায় ক্রোধ এবং রাগ থেকে মুক্ত হওয়া এটিও তাক্বওয়ার একটি শাখা।”

নেদারল্যান্ডের নুনস্পিটস্থ মসজিদ বাইতুন নূর-এ প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৯ই অক্টোবর, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, এখানে আহমদীদের বেশিরভাগ জন্মগত আহমদী অথবা তারা, যাদের পরিবারে আহমদীয়াত এসেছে একেবারে তাদের শৈশবে এবং তারা আহমদী পরিবেশেই লালিত পালিত হয়েছেন। তাদের অধিকাংশই পাকিস্তানি যাদেরকে এই দেশে থাকার এবং এখানকার নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছে এজন্য যে, তারা এখানে এসে ঘোষণা করেছেন, পাকিস্তানে আমাদের স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষানুসারে, ইসলামী শিক্ষামালা অনুসারে মত প্রকাশ বা ধর্মানুশীলনের অনুমতি নেই। কিছু মানুষ এমনও হবেন যাদের বিরুদ্ধে সরাসরি বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে।

অতএব বেশির ভাগ আহমদীকে এখানে থাকার অনুমতি প্রদান বা আপনাদের প্রতি এখানকার সরকারের স্নেহদৃষ্টির কারণ হলো, আপনারা নিজেদের আহমদী বলে পরিচয় দেন। অতএব আহমদী হওয়ার এই ঘোষণা আপনাদের ওপর কিছু দায়িত্বও অর্পণ করে আর এই দায়িত্ব থেকে সেসব আহমদীও মুক্ত নয় যারা নিজেদের শিক্ষাগত বা অন্য কোন

দক্ষতার কারণে এই দেশে এসেছেন এবং এখানে এসে নিজেদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও নৈপুণ্যে আরো ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টির সুযোগ পেয়েছেন। সেই সাথে তারা নিজেদের আহমদীয়া জামা'তের সদস্য বলেও দাবী করেন। অনুরূপভাবে নবাগত আহমদীরাও রয়েছে। তারা বয়আত করে জামা'তভুক্ত হন কেননা, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবির ওপর তাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। আর বয়আতের পর তাদের ওপরও বয়আতের এই অঙ্গীকার যথাযথভাবে পালনের দায়িত্ব অর্পিত হয়। খোদা তা'লা তাদেরকে একথা বললেই দায়মুক্ত করবেন না যে, আমরা জন্মগত আহমদীদের অথবা পুরোনো আহমদীদের যা বা যেমনটি করতে দেখেছি তাই আমরা করেছি।

এ যুগে আমাদের তরবীয়তের জন্য কুরআন ও সুন্নত সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর তফসীর, ব্যাখ্যা ও রচনাবলী বুঝা, দেখা এবং পড়া আবশ্যক। এগুলো আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে। অতএব কারো কোন অজুহাত ধোপে টিকবে না। কিন্তু এখানে পুরোনো আহমদীদের আমি এই কথাও বলব, আপনাদের আচার-ব্যবহার দেখে কেউ যদি হোঁচট খায় তাহলে তাদের এই ভুল এবং পাপের দায় আপনাদের ওপরও বর্তাবে। অতএব পুরোনো আহমদী যাদের ওপর আল্লাহ্ তা'লা এই অনুগ্রহ ও কৃপা করেছেন যে, তাদের পিতৃপুরুষ বা পূর্বপুরুষ আহমদী হয়েছিলেন অথবা যারা শিশুকালেই আহমদীয়াত গ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন আর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তারা এখানে এসে উত্তম সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছেন বা ভাল সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন তাদেরও এটি ভুলে যাওয়া উচিত নয়, তারা জামা'তের অনুগ্রহ তলে রয়েছেন।

জামা'তের এই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাদের নিজেদের অবস্থায় অসাধারণ পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টির চেষ্টা করা উচিত এবং নিজের সন্তান-সন্ততিদেরও আল্লাহ্ তা'লার জামা'তভুক্ত হওয়ার কারণে এই ইহসান বা অনুগ্রহ সম্পর্কে বলতে থাকা উচিত বা অবহিত করতে থাকা উচিত এবং সেই সাথে এটিও স্মরণ করাতে

> "আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সমস্ত আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশি গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে যে, কোন প্রকার পার্থিব আত্মীয়তা ও অন্যান্য সম্পর্ক এবং সেবক সুলভ অবস্থার মাঝে এর কোন তুলনা পাওয়া যাবে না।"

থাকা উচিত যে, তাদের দায়িত্ব কী আর আপনাদের পূর্বপুরুষরা জামা'তভুক্ত হয়ে বয়আতের যে অঙ্গীকার করেছিলেন সেই অঙ্গীকারকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রেখে আমাদের কীভাবে তা পালনের চেষ্টা করে যেতে হবে।

এখানে আসার ফলে আর্থিক যে স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি হয়েছে সেই কারণে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে আমাদের নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মের মাঝেও এই শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে এবং আমাদের সন্তানদেরকে এটি বলতে হবে, তোমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতাকে আরো প্রস্ফুটিত করার যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এর জন্য তোমরা খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে সর্বদা জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক রাখবে। আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সর্বদা বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের সম্পর্ক বজায় রাখবে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব হলো, যখন সে নিজেকে আহমদী বলে পরিচয় দিবে বা আহমদী বলে দাবি করবে তখন জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে সর্বদা সুদৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখা এবং আহমদীয়া খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের সম্পর্ক বজায় রাখা। এটি তোমার জন্য আবশ্যক কেননা, একথাই বয়আত করার সময় তুমি অঙ্গীকার করেছিলে। এটি আল্লাহ্ তা'লার ফযল বা অপার অনুগ্রহ, নবাগত আহমদীরা বিশেষ করে যারা পুরো বিশ্বাসের সাথে এবং সুস্পষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবিকে সত্য বলে মেনেছেন, তারা নিজেদের বয়আতের অঙ্গীকার এবং শর্তাবলীর ওপর অভিনিবেশও করেন।

অনেক মানুষ চিঠি-পত্রও লিখে থাকেন কিন্তু অনেকেই এমনও আছেন যারা জন্মগত আহমদী অথবা যাদের শিশুকালেই তাদের পিতামাতা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন এবং যারা পার্থিবতা উপার্জনের পিছনে লাগামহীনভাবে ছুটছে, এখানে এসে সাধারণত তারা বয়আতের শর্তাবলীর ওপর অভিনিবেশ করে না বা প্রণিধান করে না আর বয়আতের অঙ্গীকারও তারা বুঝে না এবং আহমদীয়াতের কারণে আল্লাহ্ তা'লার যে অনুগ্রহ– সেটিও তারা স্মরণে রাখে না। এখন তো এমটিএ'র মাধ্যমে সর্বত্র বয়আতের অনুষ্ঠান দেখা যায় ও শোনা যায় কিন্তু তা সত্ত্বেও এর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে বয়আতের মর্ম অনুধাবন করা এবং সে অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা তারা করে না। অনুরূপভাবে আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সেভাবে সম্পর্ক গড়ার চেষ্টাও তারা করে না যেভাবে সম্পর্ক গড়ার দায়িত্ব রয়েছে। আর এক্ষেত্রে শুধুমাত্র যারা এসাইলাম নিয়ে বা শরণার্থী হয়ে এদেশে এসেছেন তারাই নয় বরং সব শ্রেণীর মানুষ অন্তর্ভুক্ত। আমি এসাইলাম প্রার্থী বা শরণার্থীদের দৃষ্টান্ত এজন্য দিয়েছি কেননা, এখন আমার সামনে অধিকাংশই এসাইলাম প্রার্থী বা শরণার্থী রয়েছেন। আজ তাদের যে উত্তম অবস্থা তা শুধুমাত্র

জামা'তের সদস্য হওয়ার কল্যাণেই হয়েছে নতুবা এমন মানুষ সব জায়গায় এবং সব শ্রেণীতেই দেখতে পাওয়া যায়।

অতএব প্রত্যেকে যখন আত্মজিজ্ঞাসা করবে বা আত্মবিশ্লেষণ করবে তখন সে নিজেই বুঝতে পারবে, সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে বা তার অবস্থান কি? এই আত্মবিশ্লেষণের জন্য এখন আমি বয়আতের শুধুমাত্র একটি শর্ত আপনাদের সামনে পাঠ করছি। এটিকে শুধুমাত্র ভাসাভাসা দৃষ্টিতে দেখবেন না বরং এর প্রতি অভিনিবেশ করুন এবং এরপর আত্মবিশ্লেষণ করে দেখুন। যদি এই আত্মবিশ্লেষণের উত্তর ইতিবাচক হয় তাহলে সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান এবং সে আল্লাহ্ তা'লার ফযল বা কৃপা লাভ করবে। আর যদি দুর্বলতা থেকে থাকে তাহলে সংশোধনের চেষ্টা করুন। বয়আতের দশম শর্তে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, শর্তের বাক্যাবলী হচ্ছে, "আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সমস্ত আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশি গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে যে, কোন প্রকার পার্থিব আত্মীয়তা ও অন্যান্য সম্পর্ক এবং সেবক সুলভ অবস্থার মাঝে এর কোন তুলনা পাওয়া যাবে না।"

অতএব এহলো সেই বাক্য যা আমাদের ওপর তিনি (আ.)-এর প্রতি নিঃস্বার্থ এবং অসাধারণ ভালোবাসা এবং সম্পর্ক গড়ার দায়িত্ব অর্পণ করে। তিনি (আ.) আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিচ্ছেন, কী অঙ্গীকার নিচ্ছেন? এই অঙ্গীকার নিচ্ছেন, আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে আমার সাথে উন্নত মানের ভালোবাসার সম্পর্ক এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে তোলো। এই অঙ্গীকার নিচ্ছেন, তোমরা এই অঙ্গীকার কর যে, আপনার প্রত্যেক মা'রূফ ফয়সালা বা সিদ্ধান্ত মেনে নেব। অর্থাৎ প্রত্যেক সেই কাজ যার জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাকে প্রেরণ করেছেন, প্রত্যেক সেই কথা যার পানে ইসলামের শিক্ষামালার আলোকে তিনি আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন। এরপর শুধুমাত্র মান্য করাই যথেষ্ট নয়, এর প্রতি কেবল পূর্ণ আনুগত্যই নয় বরং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এর ওপর অটল থাকার চেষ্টা করব এবং আমল করব ও অনুশীলন করব। আর এই অঙ্গীকারও রয়েছে, এই ভালোবাসা এবং সম্পর্ক বন্ধন যা গড়ে উঠবে এর মান এত উন্নত হবে, এই বন্ধন এত গভীর হবে যে, পার্থিব কোন আত্মীয়তার মাঝে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না।

এই উপমা বা দৃষ্টান্ত সেই অবস্থায়ও দেখতে পাওয়া যাবে না যখন মানুষ কারো প্রতি বিশ্বস্ততার কারণে তার সাথে বিশুদ্ধ বা আন্তরিক সম্পর্ক রাখে। এর দৃষ্টান্ত এমন অবস্থায়ও পাওয়া যাবে না যখন মানুষ কারো অনুগ্রহতলে এসে নিজেকে তার হাতে তুলে দেয়। অতএব এই যে অঙ্গীকার অর্থাৎ এই পৃথিবীতে মহানবী (সা.)-এর পর উন্নত মানের ভালোবাসা যদি কারো প্রতি হতে পারে তাহলে তা তাঁর নিষ্ঠাবান প্রেমিকের সাথেই হতে পারে, এটিই হচ্ছে সেই মান যা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার পর তাঁর সাথে কিরূপ সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত, এসব কথার আলোকে প্রত্যেকেই সেক্ষেত্রে নিজের বিশ্লেষণ করতে পারে, আমাদের মাঝে এই মান প্রতিষ্ঠিত আছে কী? নাকি যখন কোন পার্থিব বিষয়াদি আমাদের সামনে আসে, পার্থিব স্বার্থ আমাদের সামনে আসে অথবা পার্থিব লাভ আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় তখন আমরা এগুলো ভুলে যাই এবং পার্থিব সম্পর্ক ও পার্থিব উদ্দেশ্যাবলী ভালোবাসার এই সম্পর্ক এবং আনুগত্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে। মানুষ কোন কাজ হয় নিজের লাভ এবং নিজের স্বার্থের জন্য করে থাকে অথবা যদি তা মনোমত না হয় তাহলে অনেক সময় বা অধিকাংশ সময় মানুষ ভয় পেয়েও করে থাকে বা করতে বাধ্য হয় কেননা, যদি তা না করে তাহলে জিজ্ঞাসা করা হবে আর হতে পারে এর ফলে শাস্তিও পাবে। অথবা ভালোবাসা এবং আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে সে তা করে। কারো যদি ধর্মের সঠিক জ্ঞান এবং বুৎপত্তি থাকে তাহলে মানুষ ভালোবাসা, আন্তরিকতা,

"তোমরা দু'টি বিষয়ের ওপর দৃষ্টি রাখো। প্রথম কথা হলো, তোমরা সত্যিকার মুসলমানের দৃষ্টান্তে পরিণত হয়ে দেখাও আর দ্বিতীয় বিষয় হলো, ইসলামের সৌন্দর্য্য এবং উৎকর্ষকে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দাও।"

নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার চেতনায় সমৃদ্ধ হয়েই ধর্মীয় কাজ করবে।

অতএব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের কাছে এই প্রত্যাশা রেখেছেন, তাঁর হাতে বয়আত করার পর আমরা এই চেতনায় উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হব। যতক্ষণ পর্যন্ত আনুগত্য এবং নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার এই চেতনা এবং সম্পর্ক নিজেদের মাঝে সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত যেসব উপদেশ দেয়া হয় এর কোন প্রভাব পড়বে না আর এর ওপর আমল করারও কোন চেষ্টা থাকবে না। অতএব যদি উপদেশের ওপর আমল করতে হয়, তাঁর (আ.) কথা মানতে হয়, নিজেদের বয়আতের অঙ্গীকার রক্ষা করতে হয় তাহলে নিজেদের ইতায়াত, আনুগত্য, নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার মানকে সমুন্নত করতে হবে। কোন আহমদী কখনো এটি ভাবতে পারে কি যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কুরআন এবং সুন্নত পরিপন্থী কোন কথা বলবেন? অবশ্যই না। এমনটি কখনোই হতে পারে না।

অতএব এটি যখন হতে পারে না তখন প্রত্যেক আহমদীর একথা অনুধাবন করা উচিত যে, মা'রূফ আনুগত্যের অর্থ হচ্ছে, ভালোবাসা এবং নিষ্ঠাকে চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিয়ে বা চূড়ান্ত মানে উপনীত করে পরিপূর্ণ আনুগত্য করা এবং পরিপূর্ণ আনুগত্য সেই অবস্থায়ই হতে পারে যখন যার আনুগত্য করা হয় তার প্রতিটি নির্দেশ সন্ধান করা হয় এবং তা জানার আগ্রহ জন্মে। অতএব আমাদের জন্য এটি আবশ্যক, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের কাছে যেসব প্রত্যাশা রেখেছেন, যেসব নির্দেশ তিনি দিয়েছেন সেগুলো যেন আমরা সন্ধান করি এবং এর ওপর আমল বা অনুশীলন করার চেষ্টা করি নতুবা এটি শুধু মৌখীক দাবি হবে, আমরা তাঁর (আ.) প্রতিটি নির্দেশ মান্য করি। আমরা যদি না-ই জানি যে, তাঁর নির্দেশ কি বা তিনি কি নির্দেশ দিয়েছেন তাহলে মানবো কি করে? বা কীভাবে মানা যেতে পারে?

অতএব আহমদী হওয়ার সাথে এই শর্তও রয়েছে, নিজেদের জ্ঞানকে বৃদ্ধি কর। আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে যে সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একে আরো মজবুত ও সমৃদ্ধ করুন আর আন্তরিকতার সাথে, বিশুদ্ধ চিত্তে নিজেদের জীবনকে সে অনুযায়ী পরিচালনা করার চেষ্টা করুন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জামা'তকে যে নসীহত করেছেন বা উপদেশ দিয়েছেন এবং জামা'তের সভ্য এবং সদস্যদের কাছে যে প্রত্যাশা রেখেছেন তা তাঁর বিভিন্ন বই-পুস্তক এবং রচনাসমগ্রে লিপিবদ্ধ আছে। এখন এর মধ্য থেকে কয়েকটি আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

"আমাদের জামা'তের এমন হওয়া উচিত যে, শুধুমাত্র মুখের কথায় যেন আমরা সীমাবদ্ধ না থাকি অর্থাৎ বাহ্যিকতার ওপর যেন আমরা না থাকি। শুধু মুখের কথা যেন না হয় বা বুলি সর্বস্ব যেন না হই বরং আমরা যেন বয়আতের মূল উদ্দেশ্যকে পূর্ণকারী হই। আর এই সত্যিকার উদ্দেশ্য বা মূল উদ্দেশ্য কী? তিনি (আ.) বলেন, আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সৃষ্টি করা উচিত। শুধুমাত্র মসলা-মাসায়েল দ্বারা তোমরা খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন যদি না হয় তাহলে তোমাদের এবং অন্যদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তিনি (আ.) বলেন, প্রত্যেকের উচিত সে যেন নিজের বোঝা বহন করে এবং নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে বা রক্ষা করে।"

অতএব শুধুমাত্র বিশ্বাসগতভাবে নিজের সংশোধন করা বা বয়আত করা, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতাকে মেনে নেয়া, বিভিন্ন মসলা-মাসায়েল বা ধর্মীয় বিতর্কে অন্যের মুখ বন্ধ করে দেয়া, এগুলো কোন মূল্য রাখে না যদি ব্যবহারিক অবস্থায় পরিবর্তন না আসে বা উন্নত না হয়। তিনি (আ.) বলেন, "তোমরা নিজেদের প্রবৃত্তির পরিবর্তনের জন্য অনেক চেষ্টা কর, সাধনা কর, নামাযে অনেক দোয়া কর। সদকা, খয়রাত এবং অন্যান্য সর্বপ্রকার চেষ্টা-প্রচেষ্টা দ্বারা "ওয়াল্লাযিনা যাহুদু ফিনা"-র মাঝে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। "ওয়াল্লাযিনা যাহুদু ফিনা"-কী? তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যারা আমাদের পথে চেষ্টা-সাধনা করে তাদের কী হয়? "লানাহ্‌দিইয়ান্নাহুম সুবুলানা" অর্থাৎ আমরা অবশ্যই তাদেরকে নিজের পথের পানে পরিচালিত করব বা হিদায়াত দিব।"

অপর একস্থানে এর আরো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "এটি কি করে হতে পারে, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে ভ্রুক্ষেপহীন হয়ে আলস্য প্রদর্শন করে সেও সেভাবেই খোদার কৃপায় কল্যাণমন্ডিত হবে যেভাবে সেই ব্যক্তি হয় যে নিজের সমস্ত মেধা, চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং পুরো আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা দ্বারা তাঁর সন্ধান করে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাকে সন্ধান করে। যে আলস্য প্রদর্শন করে সে কল্যাণমন্ডিত হতে পারে না।"

অতএব তিনি (আ.) যখন আমাদেরকে বলেন, আমার কথা মানো, আমার পিছনে চল এবং আমার সাথে আনুগত্যের সম্পর্ক বজায় রাখো তখন একথা তিনি এজন্য বলেন যেন আল্লাহ্ তা'লাকে সন্ধান করার পথ তিনি আমাদের দেখাতে পারেন, আমাদের বলতে পারেন যে, কীভাবে আমরা আল্লাহ্ তা'লাকে পেতে পারি, যেন আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণ এবং আশিসের অংশীদার বানাতে পারেন। যেন আমরা নিজেদের নামায সমূহকে নির্ধারিত সময়ে এবং সঠিক ও যথাযথভাবে আদায়কারী হই। আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা ও প্রেম-প্রীতি লাভ করার জন্য সদকা এবং দান-খয়রাতের প্রতিও যেন মনোনিবেশ করি। মোটকথা তাঁর সাথে সম্পর্ক এবং আনুগত্যের যে বন্ধন তা মূলতঃ আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদেরকে আরো সমৃদ্ধ করছে। এরপর অপর একস্থানে তিনি (আ.) আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন,

"তোমরা দু'টি বিষয়ের ওপর দৃষ্টি রাখো। প্রথম কথা হলো, তোমরা সত্যিকার মুসলমানের দৃষ্টান্তে পরিণত হয়ে দেখাও আর দ্বিতীয় বিষয় হলো, ইসলামের সৌন্দর্য্য এবং উৎকর্ষকে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দাও।" তবলীগ কর এবং এই বাণী প্রচার কর। যখন আমাদের নিজেদের জ্ঞান দুর্বল

হবে বা কম হবে এবং আমাদের ব্যবহারিক অবস্থা দুঃশ্চিন্তাজনক হবে তখন আমরা মানুষের জন্য কীভাবে আদর্শে পরিণত হতে পারি। এই অবস্থায় আমরা কীভাবে ইসলামের বাণী এবং ইসলামের উৎকর্ষতা ও সৌন্দর্য্য বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরব এবং প্রচার করব।

অতঃপর তিনি (আ.) অপর একস্থানে বলেন, "আমাদের জামা'ত এই বেদনায় বেদনার্ত হোক যে, আমাদের মাঝে তাক্বওয়া আছে কি নেই।" আমাদের সবচেয়ে বড় দুঃখ এবং বেদনা এটিই হওয়া উচিত। অতএব এর জন্য কোন দীর্ঘ বক্তৃতা এবং দীর্ঘ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। প্রত্যেকে নিজেই আত্মবিশ্লেষণ করে দেখতে পারে, তার চিন্তা পার্থিব জিনিসের জন্য বেশি নাকি ধর্মের উন্নতির জন্য তার চিন্তা বেশি। আর এই দুঃখও শুধু নিজের জন্যই আছে নাকি নিজের সন্তান-সন্ততির ক্ষেত্রেও সেই চিন্তা রয়েছে। খোদা তা'লার ভয় এবং খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের প্রতি এই মনোযোগ আছে কি নেই। নাকি পার্থিব কোন বিষয় যখন সামনে আসে তখন খোদা তা'লার সন্তুষ্টিও পিছনে পড়ে যায়। তিনি (আ.) একস্থানে বলেন, "দৈনন্দিন কার্যক্রমে অবৈধ বা অন্যায় ক্রোধ এবং রাগ থেকে মুক্ত হওয়া এটিও তাক্বওয়ার একটি শাখা।" যারা সামান্য সামান্য কথায় রেগে যায়, তাদের নিজেদের অবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত কেননা, তারাও তাক্বওয়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

এই কয়েকটি হিতোপদেশ আমি আপনাদের সামনে রাখলাম যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের বলেছেন। একথাগুলোর প্রতিই যখন আমরা অভিনিবেশ করবো বা প্রণিধান করবো এবং মনোযোগ দিব তখন এগুলো তাঁর (আ.) সঙ্গে সম্পর্ক এবং ভালোবাসায় আমাদের সমৃদ্ধ করবে। কীভাবে এবং কত বেদনার সাথে তিনি আমাদের ইহ এবং পরকালের জন্য চিন্তা করতেন! একজন পিতার চেয়ে অধিক তিনি আমাদের জন্য চিন্তিত এবং উৎকণ্ঠিত। একজন মমতাময়ী মায়ের চেয়েও বেশি তিনি আমাদের জন্য অস্থির এবং ব্যাকুল।

বারংবার তিনি আমাদের উপদেশ দেন যেন কোন না কোন ভাবে আমাদেরকে আমাদের ভুল পথ থেকে মুক্ত করে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করতে পারেন। এই চিন্তা এবং ভালোবাসা বহিঃপ্রকাশের পর এমন কোন কারণ নেই যে, আহমদী হওয়ার দাবিদার প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর (আ.) সাথে সম্পর্ক এবং আনুগত্যের মানকে উন্নত না করবে যাতে সে নিজের ইহ এবং পরকালকে সুনিশ্চিত করতে পারে। এরপর আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পর আমাদের মাঝে খিলাফতের ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেছেন আর খিলাফতের ব্যবস্থাপনাও সেই কাজকেই সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে যা আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওপর অর্পণ করেছিলেন। এই সূত্রে খিলাফতের সাথেও ইখলাস, নিষ্ঠা এবং আনুগত্যের সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমরা আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্যের পানে যাত্রা অব্যাহত রাখতে পারবো।

যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, প্রকৃত মুসলমানের দৃষ্টান্তে পরিণত হতে হবে আর ইসলামের বাণী পৃথিবীতে প্রচার করতে হবে। যুগ খলীফার হাতে প্রত্যেক আহমদীই বয়আতের অঙ্গীকার করে থাকেন। অতএব এই অঙ্গীকার রক্ষা করাও আবশ্যক এবং এর জন্য খিলাফতের পক্ষ থেকে যেসব নির্দেশনা প্রদান করা হয়, যেসব উপদেশ দেয়া হয়, যে প্রোগ্রাম বা কর্মসূচী দেয়া হয় তার ওপর আমল করার মাধ্যমেই এই অঙ্গীকার রক্ষা করা যেতে পারে।

বয়আতের সময় প্রত্যেক আহমদী এই অঙ্গীকার করে যে, সে বয়আতের এসব শর্ত পালন করবে আর যুগ খলীফা যেসব মা'রূফ সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন তার ওপর আমল করবে। যেমনটি আমি বলেছি, যুগ খলীফার কাজ হলো, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাজ আর তাঁর উপদেশকে মানুষের কাছে প্রচার করা, ইসলামের বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছানো। অতএব প্রত্যেক আহমদী

প্রত্যেক সপ্তাহে কমপক্ষে জুমুআর খুতবা শোনার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিন। প্রত্যেক পরিবার নিজের ঘরে জরিপ করে দেখুন! ঘরের প্রত্যেক সদস্য খুতবা শুনেছে কি না? যদি স্ত্রী খুতবা শোনে আর স্বামী না শোনে তাহলে কোন লাভ নেই আর যদি পিতা খুতবা শোনে আর মা এবং সন্তানরা না শোনে এতেও কোন ফায়দা নেই। একতাবদ্ধ হওয়ার জন্য এই ব্যবস্থাপনা যা আল্লাহ্ তা'লাই প্রবর্তন করেছেন, এর মাধ্যমে একই সময়ে বিশ্বের সকল প্রান্তে যুগ খলীফার আওয়াজ পৌঁছে যায়। এর অংশে পরিণত হওয়া প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক।

যখন এই চেতনাসম্মতভাবে নিজেকে গড়ে তুলবে তখনই সত্যিকার আনুগত্যের মান প্রতিষ্ঠা পাবে আর জামা'তের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তবলীগের নিত্যনতুন ক্ষেত্র প্রশস্ত হবে।

প্রত্যেকে যদি এ কথা বলে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে আমার সম্পর্ক, ভ্রাতৃত্ব এবং বিশ্বাস রয়েছে, আমি তাঁর আনুগত্য করি, (এরপর যদি) নিজ নিজ পথ নির্বাচন করতে আরম্ভ করে তাহলে কখনো উন্নতি হতে পারে না। আহমদীয়া জামা'তের সৌন্দর্য্য এতেই নিহিত কারণ, এর মাঝে অর্থাৎ জামা'তে আহমদীয়ার মাঝে খিলাফতের ব্যবস্থাপনা রয়েছে আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে প্রত্যেক আহমদীর যে সম্পর্ক রয়েছে তা এ কারণেই যে, তিনি (আ.) মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাস। পরবর্তীতে খিলাফতের সাথেও এই সম্পর্ক বজায় রাখা প্রয়োজন।

গত পরশু যখন আলমেরাতে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর রাখা হয় সেখানে আমি মসজিদের বরাতে ইসলামের শিক্ষা, মসজিদের গুরুত্ব এবং আহমদীদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা বলেছিলাম। তখন একজন স্থানীয় মহিলা অতিথি একথা প্রকাশ করেছেন যে, খলীফার কথা তো খুবই ভালো কিন্তু এখন আমরা দেখবো, এখানে বসবাসরত আহমদীরা একথার ওপর কতটুকু আমল করেন এবং প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও শান্তির পরিবেশ কতটা সৃষ্টি করতে পারেন। অতএব মানুষের দৃষ্টিও আপনাদের ওপর রয়েছে। তাই নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে আত্মবিশ্লেষণ করতে থাকা উচিত।

মানুষ খিলাফতের বরাতে গভীর দৃষ্টি রাখবে। তাই শুধুমাত্র বয়আতের অঙ্গীকার করাই যথেষ্ট নয়। নিজেদের সংশোধনের জন্যও এবং তবলীগের জন্যও আমল বা ব্যবহারিক অনুশীলন প্রয়োজন। সর্বত্র সকল শ্রেণীতে নিজেদের ঐক্যকে ধরে রাখার জন্য বা প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য এবং এক হাতের ইশারায় উঠা-বসার জন্য খিলাফতের আনুগত্য করাও প্রয়োজন। এ যুগের আহমদীরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, আল্লাহ্ তা'লা যেখানে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা এবং বিভিন্ন আবিষ্কারাদি ঘটিয়েছেন সেখানে আহমদীদেরকেও এসব সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছেন। ধর্ম প্রচারের জন্যও আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে এসব সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। টিভি, ইন্টারনেট এবং ওয়েবসাইট ইত্যাদিতে যেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লেখা বা রচনাসমগ্র আছে সেখান থেকে আমরা যখন ইচ্ছা হয় তখনই এসব জিনিস পেতে পারি। আমরা এগুলো বিভিন্ন ভাষায় শুনতেও পারি, দেখতেও পারি অর্থাৎ পড়তেও পারি। সেখানে যুগ খলীফার নসীহত এবং খুতবাগুলোও আমরা শুনতে পারি এবং পড়তে পারি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লেখার ভিত্তিই হচ্ছে কুরআন এবং হাদীস আর এর ওপর ভিত্তি করেই তিনি এসব বই-পুস্তক রচনা করেছেন যা আজ এমটিএ-এর কল্যাণে পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছে যাচ্ছে বা পৌঁছাচ্ছে। যা জামা'তকে এক হাতে ঐক্যবদ্ধ করার এক নতুন ধারণা বা রূপ দিয়েছে। অতএব আপনাদের প্রত্যেকের এই বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখা উচিত এবং প্রত্যেকেরই এই বিষয়টির প্রয়োজন রয়েছে অর্থাৎ এমটিএ-এর সাথে নিজেদের সম্পর্ক গড়ে তুলুন যাতে আপনারা এই ঐক্যের এবং একতার অংশে পরিণত হতে পারেন।

প্রত্যেক সপ্তাহে কমপক্ষে জুমুআর খুতবা শোনার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিন। প্রত্যেক পরিবার নিজের ঘরে জরিপ করে দেখুন! ঘরের প্রত্যেক সদস্য খুতবা শুনেছে কি না? যদি স্ত্রী খুতবা শোনে আর স্বামী না শোনে তাহলে কোন লাভ নেই আর যদি পিতা খুতবা শোনে আর মা এবং সন্তানরা না শোনে এতেও কোন ফায়দা নেই। একতাবদ্ধ হওয়ার জন্য এই ব্যবস্থাপনা যা আল্লাহ্ তা'লাই প্রবর্তন করেছেন, এর মাধ্যমে একই সময়ে বিশ্বের সকল প্রান্তে যুগ খলীফার আওয়াজ পৌঁছে যায়। এর অংশে পরিণত হওয়া প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক।

অতএব এই বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিন। যদি আমরা এটিই না জানি যে, কি বলা হচ্ছে, তাহলে আনুগত্য কি করে হবে। কথা শুনলে পরেই আনুগত্যের যোগ্য হবেন। অতএব এসব বিষয়ের সন্ধান করুন, সেসব কথা সন্ধান করুন যার আনুগত্য করতে হবে, নতুবা এগুলো শুধুমাত্র মৌখীক দাবি হবে আর বাহ্যিক ঘোষণা হবে মাত্র। ইজতেমায় দাঁড়িয়ে বা বয়আতের সময় এই ঘোষণা দেয়া যে, আপনি মা'রূফ যে সিদ্ধান্তই প্রদান করুন না কেন আমরা তার অনুসরণ করা ও অনুগত্য করা আবশ্যক জ্ঞান করব আর মহিলারা হয়ে থাকলে তারা নিজেদের ভাষায় বলবে, আনুগত্য অবশ্যই করব অথবা আহমদীয়া খিলাফতের দৃঢ়তার জন্য আমরা চেষ্টা করতে থাকব। আল্লাহ্ করুন প্রত্যেক পরিবার যেন এই বিষয়ের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তরবীয়তের জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেছেন এর থেকে যেন আমরা পরিপূর্ণরূপে লাভবান হই। আর শুধুমাত্র তরবীয়তই নয় বরং ইসলামের শিক্ষা প্রচারের ক্ষেত্রেও এটি (এমটিএ) অনেক বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যদি কোন কারণে লাইভ বা সরাসরি খুতবা শোনা সম্ভব না হয় তাহলে রেকর্ডিং শুনতে পারেন। ইন্টারনেটেও খুতবাগুলো রয়েছে। এছাড়া আরো অনেক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, বিশেষভাবে খুতবা এবং বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানাদি।

আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দিন, যেখানে আপনারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ হবেন সেখানে তাঁর (আ.) পর যে খিলাফতের প্রবর্তিত ব্যবস্থাপনা রয়েছে তার সাথেও যেন সুদৃঢ় সম্পর্ক হয় আর আনুগত্যের দৃষ্টান্ত উপস্থাপনকারী হোন। আর মহানবী (সা.)-এর হাদীস অনুসারে এই সম্পর্ক এবং এই আনুগত্য পরবর্তীতে মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্যকারী এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকারী বানাবে। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াবো যা আমাদের মুরুব্বী মোকাররম মোহাম্মদ হাফেয ইকবাল ওড়ায়েচ সাহেবের। যিনি গত ২রা অক্টোবর ২০১৫ সনে এক দুর্ঘটনায় ৪৯

বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। গত ২রা অক্টোবর সকাল বেলা তিনি একাই তার পিতৃপুরুষের গ্রাম চকপুনিয়ারে নিজের চাচার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন। ভালওয়ালের কাছে রেললাইন ক্রস করার সময়, তিনি সম্ভবত দেখেন নি, ট্রেন আসে এবং তাকে ও তার গাড়িকে হিচড়ে নিয়ে যায় বা সংঘর্ষ হয়। যাহোক বাহ্যিকভাবে তার শরীরে কোন আঘাত লাগেনি। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। এ্যাম্বুলেন্স ডেকে পাঠানো হয় বা গাড়ি চেয়ে পাঠানো হয় এবং তাকে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছানো হয় কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছেও তার প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয় নি।

হাফেয মোহাম্মদ ইকবাল সাহেবের দাদার নাম ছিল চৌধুরী ফযল আহমদ সাহেব। তার বড় দাদা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন, তাঁর নাম ছিল চৌধুরী আল্লাহ্ বক্স সাহেব। ১৯০১ সনে তার বড় দাদা বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। তার বড় দাদার পূর্বের নাম ছিল রসূল বক্স। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তা পাল্টে আল্লাহ্ বক্স রেখেছিলেন। তার পিতা চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ ওড়ায়েচ সাহেবও অবসর গ্রহণের পর জীবন উৎসর্গ করে দীর্ঘদিন রাবওয়াতে জামা'তের বিভিন্ন দপ্তরে কাজ করেছেন। হাফেয সাহেব অর্থাৎ মুরুব্বী সাহেব রাবওয়াতেই প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর তিনি কুরআন হিফ্য করেন। স্কুলের শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হন। এছাড়া তিনি আরবী এবং উর্দূতে ফাযেল ডিগ্রি অর্জন করেন।

পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে তিনি কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি এতিমদের দেখা-শোনার জন্য জামা'তের যে কমিটি রয়েছে সেই কমিটির সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তার পাঁচজন সন্তান রয়েছে। তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। দুই সন্তান এখনও ছোট, একজনের বয়স সতের এবং অপর জনের বয়স দশ বছর। তার ভাই জনাব তাহের মেহদী ইমতিয়াজ সাহেবও সিলসিলাহ্‌র মুরুব্বী এবং বর্তমানের যিয়াউল ইসলাম প্রেস রাবওয়ার ম্যানেজার। কিন্তু আল্ ফযলের ওপর যখন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় তখন তার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হয় যে কারণে কয়েক মাস ধরে বা দীর্ঘদিন যাবত তিনি জেলে বন্দী আছেন। আল্লাহ তা'লা দ্রুত তার মুক্তির ব্যবস্থা করুন কেননা, আদালতই অত্যন্ত ভীতু। জজ প্রথমে জামিন দিয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে মৌলভীদের ভয়ে তা বাতিল করে দেয়। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরও ইনসাফ তথা ন্যায়বিচারের তৌফিক দিন আর যেসব নিষ্পাপ জেলে বন্দী আছেন আল্লাহ্ তা'লা দ্রুত তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করুন।

মাহবুব আহমদ রাযেকী সাহেব যিনি সাদউল্লাহ্‌পুর জামা'তের প্রেসিডেন্ট তিনি বলেন, ২০০৩ সনে যখন সাদউল্লাপুরে জামা'তের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক বা খারাপ ছিল তখন এখানে মুরুব্বী হিসেবে হাফেয ইকবাল সাহেবের পোস্টিং হয়। তিনি অ-আহমদী বিরুদ্ধবাদীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন যার ফলে বিরুদ্ধবাদীরা শুধুমাত্র বিরোধিতা থেকেই বিরত হয়নি বরং একজন যে অনেক বড় বিরুদ্ধবাদী এবং নেতৃস্থানীয় ছিল সে আহমদীয়াতের বিরোধিতা করার কারণে ক্ষমাও চেয়েছিল। এদিক থেকেও তিনি তাদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করেছেন এবং সম্পর্ককে আরো দৃঢ় করেছেন।

এটি ভিন্ন কথা যে, পাকিস্তানে ভয়ের কারণে, মোল্লাদের ভয়ে বা সমাজের ভয়ে ভীত হয়ে অনেক বড় একটি শ্রেণী যারা আহমদীয়াতকে পছন্দ করেন এবং জামা'তের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার রয়েছে সেটিকে অপছন্দ করেন, কিন্তু প্রকাশ্যে তারা ঘোষণা দিতে পারে না। তবে আল্লাহ্ তা'লা ছোট ছোট এলাকায় এমন ব্যবস্থা করে থাকেন বা এমন সুযোগ সৃষ্টি করে থাকেন যেখানে মানুষ প্রকাশ্যেও স্বীকৃতি দেয়। তিনি বর্তমানে যে অফিসে কর্মরত ছিলেন বা জামা'তের সেবা করছিলেন সেখানকার একজন কর্মী মজিদ সাহেব বলেন, হাফেয সাহেব মুরুব্বী হিসেবে যেখানেই কর্মরত ছিলেন সেখানকার সদস্যদের সাথে মৃত্যুকাল পর্যন্ত যোগাযোগ বহাল রেখেছেন। মানুষ তার কাছে আসতো, তার পরামর্শ নিত এবং তিনি তাদের সাহায্যও করতেন। এটি তার অনেক বড় একটি গুণ ছিল। কেন্দ্রের অর্থ সাশ্রয় করার প্রতি সর্বদা তার চেষ্টা ছিল অর্থাৎ কেন্দ্রের অর্থ যেন সঠিক জায়গায় বা যথাযথ স্থানে খরচ হয়। আর বিধবাদের গৃহ নির্মাণের জন্য তিনি যথাসম্ভব চেষ্টা করতেন এবং এই চেষ্টাও করতেন যেন স্বল্প মূল্যে ঘর বানানো সম্ভব হয়। অনেক সময় যেখানে নির্মাণ কাজ হতো সেখানে তিনি যদি ঘটনাচক্রে পৌঁছে যেতেন তাহলে সেখানে গিয়ে তিনি নিজেই মিস্ত্রীদের সাথে কাজে লেগে যেতেন।

লন্ডনে অবস্থিত আমাদের রাশিয়ান ডেস্কের খালেদ সাহেব বলেন, তিনি তার সহপাঠি ছিলেন এবং অত্যন্ত অতিথিসেবক ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি বলেন, একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল, তার মাঝে তবলীগের খুবই আগ্রহ এবং উদ্দীপনা ছিল। সম্ভবত তিনি যখন সাদেকাবাদ বা সাদউল্লাহ্‌পুরে কর্মরত ছিলেন, সেখানে একটি রাশিয়ান কোম্পানি কোন প্রজেক্টে কাজ করছিল। রাশিয়ান ভাষা না জানা সত্ত্বেও তিনি তাদের তবলীগ করতেন। খালেদ সাহেব যেহেতু রাশিয়ায় থেকে ভাষা শিখেছিলেন তাই তিনি যখন পাকিস্তান যান তখন তার কাছ থেকে তিনি কিছু বাক্য শিখে নেন। এরপর তিনি নিজেই রুশ ভাষার কিছু বাক্য উর্দূ ফনেটিকে লিখে রাখেন যেন তবলীগ করতে পারেন। তবলীগের জন্য এমনই উদ্যম এবং উচ্ছাস ছিলো তার মাঝে।

আল্লাহ্ তা'লা সব মুরব্বীকে তৌফিক দান করুন তারা যেন অবস্থা এবং পরিস্থিতি যাই হোক না কেন নিত্য-নতুন তবলীগের পথ খুঁজে বের করেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুম হাফেয সাহেবের সাথে ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন। তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার স্ত্রী সন্তানদের ধৈর্য ও দৃঢ়তা দান করুন এবং তার পুণ্যকর্ম সমূহ অবলম্বন করার তৌফিক দিন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

আল্ ইস্তিফতা

বিবেকের কাছে প্রশ্ন

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

(৫ম কিস্তি)

হে যুবকসমাজ, যুগের পন্ডিতগণ, যুগ-আলেমগণ ও দেশের বিজ্ঞজন! যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আবির্ভূত হবার দাবি করে, যার পক্ষে আল্লাহ্‌র সমর্থন দীপ্ত-দিবাকরের ন্যায় সুস্পষ্ট আর তাঁর সত্যতার জ্যোতি অন্ধকার রাতে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিকশিত–সে ব্যক্তি সম্পর্কে আপনাদের কি মতামত? আল্লাহ্ তা'লা তাঁর জন্য সমুজ্জ্বল নিদর্শনাবলী প্রকাশ করেছেন। যে কাজেরই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাঁর সমর্থনে দাঁড়িয়েছেন। শত্রু-মিত্র সবার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর দোয়া গ্রহণ করেছেন। নবী (সা.) যা বলেন এই অধম তা ছাড়া অন্য আর কিছু বলেন না আর তিনি হিদায়াত থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত নন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে স্বীয় ওহীতে নবী আখ্যা দিয়েছেন। আর ইতোপূর্বে আমাদের রসূল মুস্তফা (সা.)-এর ভাষায় আমাকে নবী উপাধি দেয়া হয়েছে।* নবুয়ত বলতে তিনি শুধু বুঝিয়েছেন, আল্লাহ্‌র সাথে সমধিক বাক্যালাপ, তাঁর পক্ষ থেকে অদৃশ্যের প্রভূত সংবাদ প্রাপ্তি ও

***টিকা:**

যদি কোনো ব্যক্তি প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ্ যেহেতু নবুয়ত বন্ধ করে দিয়েছেন তাই এই উম্মতে কোনো নবী কীভাবে আসতে পারে? এর উত্তর হলো, তিনি এ ব্যক্তিকে নবী আখ্যায়িত করেছেন আমাদের নেতা, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি (সা.)-এর নবুয়তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য। কেননা উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হওয়া ছাড়া নবীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। নতুবা এটি এমন একটি দাবি হবে বিচক্ষণদের দৃষ্টিতে যার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। এক ব্যক্তির সত্তায় যতক্ষণ পর্যন্ত নবুয়তের পরম বৈশিষ্টাবলী লোপ না পাবে তার মাঝে নবুয়ত কীভাবে সমাপ্ত হতে পারে? অন্যদের কল্যাণমন্ডিত করার পরাকাষ্ঠাই হলো নবীর মহান পরাকাষ্ঠা। উম্মতে যদি এর কোনো দৃষ্টান্ত না থাকে তাহলে এটি প্রমাণিত হয় না। এছাড়া আমি একাধিকবার বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা আমার নবুয়ত বলতে অধিক কথোপকথন ও অধিক বাক্যালাপ বুঝিয়েছেন আর জ্ঞানী সুন্নি আলেমদের দৃষ্টিতে তা একটি স্বীকৃত ব্যাপার। বিতন্ডা কেবল শব্দের ব্যবহার নিয়ে, তাই হে বিবেকবান ও বিচক্ষণগণ! তাড়াহুড়া করে কিছু বলে বসো না। যে কেউ এর পরিপন্থী কোনো তুচ্ছ দাবিও করবে তার ওপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত একই সাথে মানুষ এবং ফিরিশ্‌তাদেরও অভিশাপ-লেখক।

ব্যাপকভাবে ওহী লাভ করা। তিনি বলেন, নবুয়ত বলতে আমরা তা বুঝাই না যা অতীত ঐশী গ্রন্থে বুঝানো হয়েছে বরং তা এখন এমন একটি পদমর্যাদা যা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আমাদের নবী (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্য ছাড়া প্রদান করা হয় না। এই পদমর্যাদা যার লাভ হবে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সাথে সমধিক ও স্বচ্ছ বাক্যালাপ করবেন; কিন্তু শরীয়ত পূর্বের অবস্থায় বহাল থাকবে। এর কোনো নির্দেশ বিয়োজিতও হবে না আর কোনো দিক-নির্দেশনা এর সাথে সংযোজিতও হবে না।

তিনি আরও বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর উম্মতের এক সদস্য আর তা সত্ত্বেও মুহাম্মদী নবুয়তের কল্যাণধারার অধীনে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে নবী আখ্যায়িত করেছেন। আর তিনি আমার প্রতি যা ওহী করতে চেয়েছেন তা করেছেন। আমার নবুয়ত মূলত মহানবী (সা.)-এরই নবুয়ত। আর আমার পোশাকে তাঁর জ্যোতি ও কিরণ বৈ অন্য কিছু নেই। যদি তিনি না হতেন তাহলে আমি উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয়-বরণীয় কিছু হতাম না। নবীকে চেনা যায় তাঁর কল্যাণধারার মাধ্যমে। আমাদের নবী (সা.) যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং কল্যাণ প্রবাহের দিক থেকে সবচেয়ে অগ্রগামী আর যিনি পদমর্যাদায় সবচেয়ে মহান ও সবার উর্ধ্বে; তাঁর সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা? যে ধর্মের আলো হৃদয়কে আলোকিত করে না, যা পিপাসার্তের পিপাসা নিবারণ করে না, যার আগমন মনকে প্রশান্ত করে না আর যার এমন কোনো বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে প্রশংসা করা হয় না যা প্রকাশ হলে সত্য স্পষ্ট হতে পারে; সেটি কিসের ধর্ম? অধিকন্তু যা অস্বীকারকারী কাফির এবং মু'মিনের মাঝে কোনো পার্থক্য নিরূপণ করে না তা-ই বা কিসের ধর্ম? এ ধর্মে প্রবেশকারী এবং এ ধর্ম থেকে যে বেরিয়ে যায় তাদের উভয়ই কি সমান? দু'এর মাঝে কি কোনো পার্থক্য নেই? সে ধর্মের কী-ই বা বিশেষত্ব যা মানুষের যাবতীয় কামনা-বাসানার অবসান ঘটিয়ে অন্য (আধ্যাত্মিক) জীবনের মাধ্যমে তাকে সঞ্জীবিত করে না? যে আল্লাহ্‌র, আল্লাহ্ তার–পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতির মাঝে এটিই তাঁর রীতি ছিল। যে নবী আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনের বৈশিষ্ট্য রাখে না তার সত্যতার কোনো প্রমাণ থাকে না; এ অবস্থায় যে তার কাছে আসবে, সে তাকে চিনতে পারবে না। আর তাকে সেই রাখালের সাথে তুলনা করা যায়, যে নিজের মেষকে ঘাষ-পাতাও দেয় না আর পানিও পান করায় না, বরং ঘাট ও চারণভূমি থেকে সেগুলোকে দূরে রাখে।

তোমরা জান, আমাদের ধর্ম একটি জীবন্ত ধর্ম আর আমাদের নবী (সা.) মৃতদের জীবিত করেন। তিনি আকাশ থেকে মহা কল্যাণরাজিসহ মুষলধারে বর্ষণরত বারিধারার ন্যায় আবির্ভূত হয়েছেন। এই মহান বৈশিষ্ট্যে কোনো ধর্ম এর সামনে দাঁড়াতে পারবে না। একজন মানুষের জীবন থেকে স্থূলতার পর্দা অপসারণ এবং ঐশী প্রাসাদ ও আল্লাহ্‌র দ্বার পর্যন্ত এই প্রদীপ্ত ধর্ম ছাড়া আর কেউ পৌঁছাতে পারে না। যে এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে সে অন্ধ বৈ কিছু নয়।

লোকেরা সম্মিলিতভাবে এই বান্দার বিরুদ্ধে তরবারী হাতে নিয়েছে তাই সৃষ্টির প্রভু-প্রতিপালকও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। তাদের কতককে খণ্ড-বিখণ্ডিত করেছেন, কতককে লাঞ্ছিত করেছেন আর কতককে তাঁর শাস্তিমূলক সংবাদ অনুসারে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছেন। তারা তাঁর প্রতি অন্যায় করা ও তাঁর বিরুদ্ধে নিছক মিথ্যাচারেরই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের সকল দল খোদাভীতি বা তাক্বওয়ার পথকে বিসর্জন দিয়েছে। তারা সত্য পথ এমনভাবে এড়িয়ে গেছে যেন কোনো সিংহ সে পথে মানুষকে আক্রমণের জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে বা সর্প দংশনের ভয় আছে বা অন্য কোনো বিপদ সেপথে অপেক্ষা করছে। তাদের বাসনা ছিল এই অধমকে হত্যা করা হোক বা কারাগারে প্রেরণ করা হোক অথবা দেশান্তরিত হোক; যেন পরে বলতে পারে– মিথ্যাবাদী ছিল তাই আল্লাহ্ তা'লা তাকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করেছেন বা তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ভূলোক ও উর্ধ্বলোক থেকে উপর্যুপরি সাহায্য দিয়েছেন। তিনি বিজয়ের জন্য দোয়ার হাত উঠিয়েছেন, ফলে সকল অহংকারী ব্যর্থ হয়েছে। সকল সমস্যার সময় আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে কাতর চিত্তে দোয়া করার সামর্থ দিয়েছেন এবং তাঁকে সম্মানিত করেছেন। আর যখনই তিনি দোয়া করেছেন তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছেন। তাঁর দোয়ায় একটি প্রভাব বিস্তারী বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। যে তাঁর বিরুদ্ধে দোয়া করেছে সে ধ্বংস হয়েছে। অনেক মানুষ তাঁর দোয়ার তীরে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে শোচনীয় মৃত্যুর স্বাদ পেয়েছে অথচ তারা তাঁর মৃত্যুর দিন-ক্ষণ দেখার প্রবল বাসনা রাখতো আর বলতো, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ওহীর মাধ্যমে তার মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছেন। নিশ্চয় এতে বিবেকবানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ঘরকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন। যে সেই গৃহে প্রবেশ করেছে সে প্লেগ থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছে। কোনো রোগ বা ক্লেশ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি; অথচ এর চারপাশ থেকে মানুষকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া হয়। নিশ্চয়ই যার চোখ আছে সে এতে খোদার কুদরত বা (খোদার) শক্তিমত্তার প্রমাণ খুঁজে পাবে। পুণ্যবানদের কল্যাণার্থে তিনি তাঁকে অনেক ফলবাহী পুণ্যকর্মের সুযোগ দান করেছেন, মনে হয় যেন তা এমন বাগান যার তলদেশ দিয়ে নহর বা স্রোতস্বিনী বহমান। পৃথিবীতে তিনি তাঁকে গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন। সৃষ্টি অহর্নিশি তাঁর পানে দুর্বার আকর্ষণে ছুটে চলেছে আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি অনেক চক্ষুষ্মানকে আকৃষ্ট করেছেন যারা পবিত্রচেতা ও বড় সাধু প্রকৃতির মানুষ। তাদের হৃদয় স্বচ্ছ আর বক্ষ সমুদ্রের মত প্রশস্ত। তিনি তাদের হৃদয়ে পরস্পরের জন্য প্রীতি সঞ্চার করেছেন। তাদের হৃদয় থেকে সকল প্রকার অহংকার ও আত্মম্ভরিতা বের করে দিয়েছেন। আর এ সম্পর্কে তখন আমাকে অবহিত করেছেন যখন এই অধম আদৌ উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। এই সাহায্য তখন সম্পূর্ণভাবে মানুষের দৃষ্টি ও ভাবনার অগোচরে ছিল। তিনি তাঁকে সত্যের এক এমন ছুরী দান করেছেন যদ্বারা তিনি শত্রুকে লাঞ্ছিত করেন। অতএব, তারা গোপন পরামর্শের পর ষড়যন্ত্ররূপী যে সকল সাঁপ বুনেছে যষ্ঠি তার সবকটি গ্রাস করেছে। আর তিনি

প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যে তাঁকে (এ অধমকে) লাঞ্ছিত করতে চাইবে তিনি তাকে লাঞ্ছিত করবেন। কার্যত যে অপমান করতে চেয়েছে আর ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে সে লাঞ্ছিত হয়েছে। তারা জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে অথচ তাদের নিজেদের হৃদয় জাগতিক কামনা-বাসনায় আচ্ছন্ন। তারা আল্লাহ্‌র জামা'তকে রক্তচক্ষু দেখাতো, বানোয়াট কথার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বান্দাদের কষ্ট দিত। সত্যের নিবাসে তারা প্রবেশ করতো না বরং যে তাতে প্রবেশ করতে চাইতো আর যে অবাধ্য নয় তাকে তারা বাধা দিত।

সুতরাং, খোদা তা'লা তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত। তাদের জন্য আগুনের পোশাক প্রস্তুত করেছেন এবং আক্ষেপের লেলিহান শিখা তাদের জন্য প্রজ্জলিত করেছেন যা সহ্য করা তাদের পক্ষে অসম্ভব আর তারা উৎকণ্ঠার অগ্নিস্ফুলিঙ্গকেও প্রতিহত করতে পারবে না। আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার কোনো উপায় তাদের নেই আর এমন কেউ নেই যে তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারে। ডানে বা বামে তাকিয়েও তারা এমন কাউকে পাবে না যে তাদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। সুতরাং পরিণামে তারা চরম ক্ষয়ক্ষতি ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার হয়েছে। এই বান্দার প্রতি তারা যে তীর ছুঁড়েছে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে তাদের দুষ্কৃতি থেকে রক্ষা করেছেন। তিনি তাঁকে নিরাপত্তার বেষ্টনীতে এবং শান্তির নীড়ে আশ্রয় দিয়েছেন। তারা স্রষ্টার তকদীর বা সিদ্ধান্তকে পরিবর্তনের জন্য সকল শক্তি ক্ষয় করেছে আর যে আলো অবতীর্ণ হয়েছে তা নিজেদের মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চেয়েছে। পাথর হয়ে তারা তাঁর ওপর আছড়ে পড়েছে। তাঁর নাম চিহ্ন যাতে শেষ হয়ে যায় এ অভিলাষে তারা চাইতো যে, ভূমি তাকে গ্রাস করুক বা তাঁর ওপর পাহাড় ভেঙ্গে পড়ুক। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে নিজ সন্নিধান থেকে প্রবল-পরাক্রমে সাহায্য করলেন যেন এটি তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের হাতে কোনো প্রমাণ দেন না। আর আল্লাহ্ তা'লা তাদের সম্পর্কে যে অশুভ অদৃষ্টের সংবাদ দিয়েছেন তারা তা কোনোভাবে ঠেকাতে বা দূর করতে সক্ষম হয় নি। আল্লাহ্ তা'লা এই প্রত্যাদিষ্ট বান্দাকে শুভ সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর হিফাযত ও নিরাপত্তা বিধান করবেন আর যে সকল দুষ্কর্মকারী তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে তারা তাঁর কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। তিনি ক্ষমাশীল খোদার কৃপাবারিতে সিক্ত জীবন যাপন করবেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় নিরাপত্তার চাদরে তাঁর নিরাপত্তা বিধান করেন। আপন সন্নিধানে তাঁকে স্বাগত জানান আর তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে ধারালো তরবারী হয়ে কাজ করেন এবং সকল ক্ষেত্রে তাঁকে বন্ধুর ন্যায় সাহায্য করেন। তাঁর অস্বচ্ছলতাকে স্বচ্ছলতায় বদলে দেন আর ভূমিকে তাঁর জন্য একটি সবুজ উপত্যকায় বা ফল-ফলাদিতে পরিপূর্ণ বাগানে পরিণত করেছেন। তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে বরকত বা কল্যাণ নিহিত রেখেছেন এবং তাঁকে কলুষমুক্ত করেছেন। তাঁর প্রদীপের আলো তিনি দেশে দেশে বিস্তৃত করেছেন ফলে তাঁর প্রতি বহু পুণ্যাত্মা আকৃষ্ট হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের দেশ মাতৃকার মায়া ত্যাগ করে ক্ষমাশীল খোদার কৃপা লাভের বাসনায় তাঁর গ্রামকে আপন নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ফলে শত্রুরা নিজেদের অভ্যন্তরীণ হিংসার কারণে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে আর সকল ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করে; কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্র প্রহেলিকা ছাড়া কিছুই ছিল না। তারা সকল তূণ বা বাণাধার থেকে তীর বের করেছে, *(অর্থাৎ সকল প্রকার ষড়যন্ত্র করেছে- অনুবাদক)* প্রথম দিকে আর এর পরিণামে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ধ্বংস ছাড়া আর কিছু দেখে নি। তারা সর্বসম্মতভাবে একই ধনুক থেকে তাঁর প্রতি তীর ছুড়েছে কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র কৃপাধন্য হয়ে নিরাপদে ঘরে ফিরেছেন আর দেশে-দেশে তাঁর সম্মান ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করেন এবং আপন প্রতিশ্রুতি সত্য প্রমাণ করেন আর নিজ সন্নিধান থেকে তাঁকে অনেক সাহায্যকারী দান করেন। তাঁকে তিনি শুভসংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি শত্রুদের হাত থেকে তাঁকে নিরাপদ রাখবেন, তাঁর ওপর হামলাকারী প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর তিনি পাল্টা হামলা করবেন। এভাবে তিনি নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন আর তাঁকে সকল অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রেখেছেন।

তাঁকে তিনি সকল কলুষ থেকে পবিত্র এক মনোনীত ব্যক্তির সম্মান দিয়েছেন এবং তিনি তাকে পবিত্র করেছেন। নিভৃত আলাপচারিতার জন্য তিনি তাঁকে নৈকট্য প্রদান করেছেন আর তাঁর প্রতি যা ওহী করতে চেয়েছেন তা করেছেন এবং নিজের পক্ষ থেকে তাঁকে সঠিক চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ করেছেন ও সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। তাঁর জন্য দ্যুলোক ও ভূলোকের সকল নিদর্শনের সমাহার ঘটিয়েছে আর তাঁর ওপর শত্রুদের সকল আক্রমণ তিনি প্রতিহত করেছেন। তাঁর সকল বিষয়ের ভিত্তি রেখেছেন তাক্বওয়ার ওপর। তাঁর সকল অগোছালো বিষয়কে সুশৃংখল করেছেন। তাঁর নিক্ষিপ্ত তীর তিনি অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো নিশ্চিত করেছেন। জগতকে তার দাসীতুল্য বানিয়েছেন। যে তাঁর কাছে কার্পণ্য ও নীচ কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে আসে তার জন্য সকল নিয়ামতের দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। তিনি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং লালন-পালন করেছেন। তাঁকে নিজ সন্নিধান থেকে শিখিয়েছেন। তিনি তাঁকে সুমহান তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ করার জন্য বেছে নিয়েছেন। নিশ্চয় তিনি তোমাদের কাছে নির্ধারিত সময়ে এসেছেন।

সুতরাং এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের কী ধারনা? তিনি কি সত্যবাদী নাকি মিথ্যাবাদী? এই কৃপা বা অনুগ্রহের উৎপত্তি কোথায়? আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে যা দেয়ার সব দিয়েছেন। এমন মহান কাজের কুদরত বা শক্তি শয়তান রাখে কি? পরিষ্কার করে কথা বল, তোমাদের পুরস্কৃত করা হবে। সেই সিদ্ধান্তের দিনকে ভয় কর যা সকল গোপন বিষয় প্রকাশ করে দেবে।

(চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বি সিলসিলাহ্

জুমুআর খুতবা

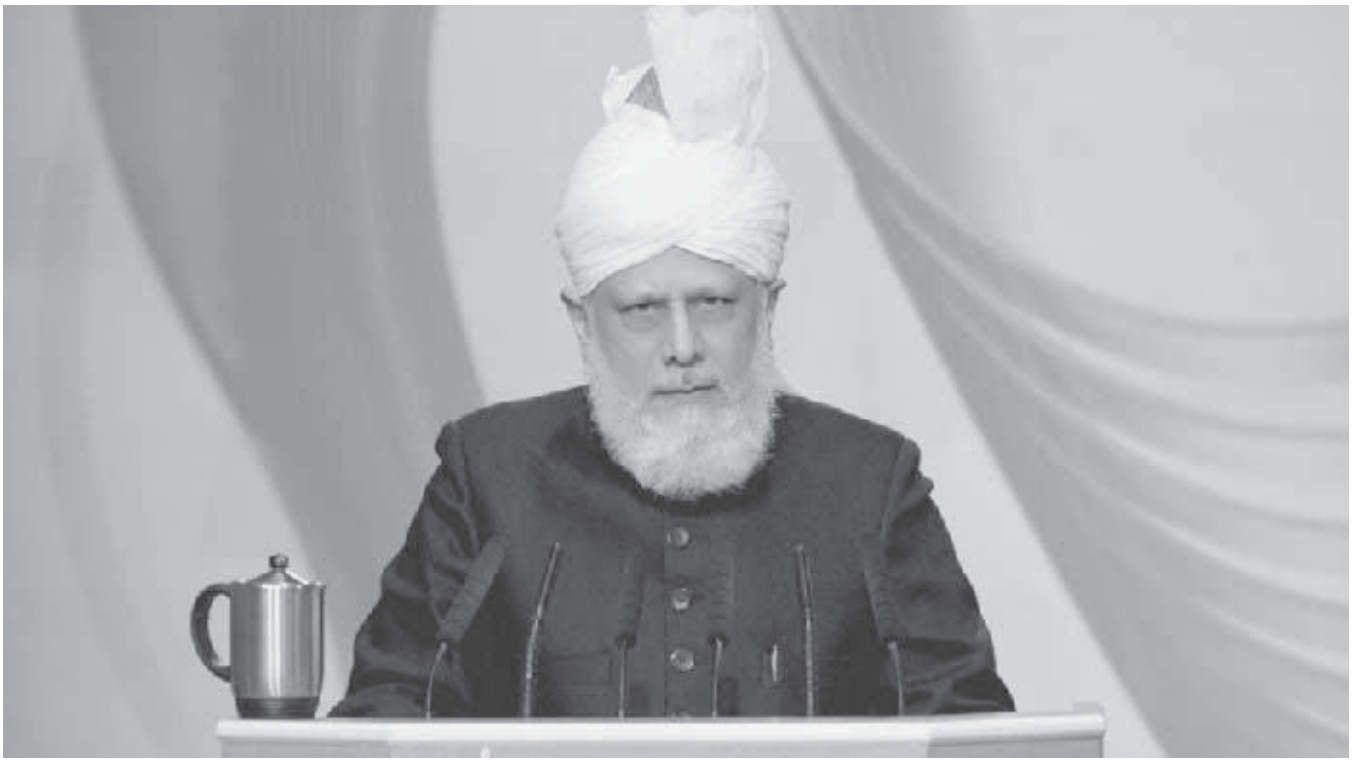

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)– মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা ও উত্তম আদর্শের প্রকৃত ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০১৫-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দাসত্বে ধর্মের-সংস্কারের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে পাঠিয়েছেন। তিনি (আ.) আমাদেরকে ধর্মের মূল, এর ভিত্তি এবং এর প্রকৃত শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করে দেখিয়েছেন, বিভিন্ন বিদ'আত এবং ভুল আচার অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতি পরিহারের নসীহত করেছেন। অতএব এ যুগে তিনি (আ.) মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা এবং তাঁর উত্তম আদর্শের প্রকৃষ্ট উদাহরণ আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আদর্শও আমাদের জন্য আলোকবর্তিকা।

আমরা সৌভাগ্যবান! কেননা আমাদেরকে আমাদের পুণ্যবান পিতা-পিতামহ এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবীরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সংক্রান্ত বিভিন্ন রেওয়ায়েত বা ঘটনা শুনিয়েছেন বা পৌঁছিয়েছেন। পুরোনো আহমদীদের অনেকেই এমন হবেন যারা প্রবীণদের কাছে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে কিছু ঘটনা এবং রেওয়ায়েত সরাসরি শুনে থাকবেন, যারা (প্রবীণরা) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে দেখেছেন এবং তাঁর সাহচর্যে কল্যাণমণ্ডিত হয়েছেন। যাহোক একস্থানে এসব রেওয়ায়েত বা ঘটনার গুরুত্ব

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) নিজের বিশেষ রীতি অনুসারে বর্ণনা করেছেন।

এই ঘটনাগুলো বাহ্যত খুবই ছোট কিন্তু এসব কথা থেকে এবং এসব রেওয়ায়েত বা ঘটনা থেকে অনেক উপদেশ ও ইসলামের মৌলিক শিক্ষা সংক্রান্ত কথা তিনি (রা.) বের করেছেন বা গ্রহণ করেছেন যা এখন আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর যুগে অনেক সাহাবী জীবিত ছিলেন। তাই তিনি সে সময়ে সেসব রেওয়ায়েত বা ঘটনা একত্রিত করার লক্ষ্যে সাহাবীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন বা নসীহত করেছেন বা তাদের আত্মীয়-স্বজনের দৃষ্টি এর প্রতি আকর্ষণ করেছেন কেননা, এসব বিষয়ই আগত প্রজন্মের জন্য নসীহত ও প্রকৃত শিক্ষা এবং বিভিন্ন বিষয়ের সমাধান তুলে ধরবে।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একস্থানে বলেন, এ বছর একটি কথার প্রতি বিশেষভাবে জামা'তের মনোযোগ আকর্ষণ করেছি আর তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর পুরো পটভূমি হলো, এক যুগে জামা'তে ফিৎনা মাথা চাড়া দিলে কীভাবে তা প্রতিহত করা উচিত সে বিষয়টি তিনি (রা.) তুলে ধরেন, তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথা যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে আমাদের কর্ণগোচর হয় তা আমাদের জন্য সাহায্যকারী ও অনেক নৈরাজ্য থেকে রক্ষাকারী হয়ে থাকে আর অনেক পাপ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করে থাকে। যাহোক তিনি যে বিষয় বর্ণনা করছিলেন সে সম্পর্কে বলেন, যতবারই এর গুরুত্বের প্রতি জামা'তের মনোযোগ আকর্ষণ করা হোক না কেন তা যথেষ্ট নয়। আর তাহলো, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনাচরণ এবং তাঁর কথা সাহাবীদের মাধ্যমে সংকলিত করা।

তিনি বলেন, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি ছোট থেকে ছোট কথাও যদি স্মরণ থাকে তাহলে তার সে কথা গোপণ রাখা এবং অন্যদের কাছে না বলা এটি জাতিগত বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অনেক কথা বাহ্যত ছোট হয়ে থাকে বা ক্ষুদ্র হয়ে থাকে কিন্তু অনেক তুচ্ছ কথাও ফলাফলের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। তিনি (রা.) বলেন, দেখুন! এটি কত ছোট্ট বা সামান্য একটি কথা, যেমনটি হাদীসে আছে, "মহানবী (সা.)-এর জন্য একবার কদু বা লাউয়ের তরকারী রান্না করা হয়। তিনি (সা.) গভীর আগ্রহের সাথে সেই তরকারী থেকে বেছে বেছে লাউ খেতে থাকেন। এমনকি এক পর্যায়ে ঝোলে লাউয়ের আর কোন টুকরোই বাকি ছিল না। তিনি (রা.) বলেন, লাউ খুবই উন্নত মানের তরকারী।"

তিনি বলেন, এটি বাহ্যত অনেক ছোট্ট একটি কথা। অনেক আহমদীও হয়তো শুনে বলবে, লাউয়ের কথা বলার কী প্রয়োজন ছিল। আর আজকাল যারা খুব শিক্ষিত সাজে তাদের এসব কথার প্রতি দৃষ্টি যায় না বা মনে করে, এটি সামান্য একটি কথা কিন্তু এই ছোট্ট একটি কথার মাধ্যমে ইসলামের কত বড় উপকার হয়েছে। আজ আমাদের যুগে মুসলমানদের মাঝে যেসব রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে আমরা তা ধারণাই করতে পারি না কিন্তু ইসলামের ওপর এমন একটি যুগও এসেছে যখন ভারতে হিন্দু সংস্কৃতি মুসলমানদেরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে আর সেই প্রভাবের বশে তারা ধারণা করে বসেছিল, নেক লোক তারাই যারা নোংরা জিনিস খায়, যারা ভাল জিনিস খায় না, যারা উন্নত মানের খাবার খায় না। এটি হলো পুণ্যের মানদণ্ড। কেননা ফকির, দরবেশ বা যোগীদের এটিই রীতি। তারা কাউকে ভাল খাবার খেতে দেখলেই বলে বসে, এ ব্যক্তি পুণ্যবান কীভাবে আখ্যায়িত হতে পারে? অর্থাৎ ধারণাই করা যায় না যে, কেউ পুণ্যবান আখ্যায়িত হয়ে ভাল খাবার খাবে বা খেতে পারে।

তিনি (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) মসজিদে আকসায় দরস প্রদান শেষে নিজের ঘরে ফিরে যাচ্ছিলেন। সেযুগে কাদিয়ানের যেখানে নাযারাতের বিভিন্ন দপ্তর বা অফিস ছিল– তিনি (রা.) যখন সেখানে পৌঁছেন তখন সেখানকার একজন অবসরপ্রাপ্ত হিন্দু ডেপুটির সাথে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর সাক্ষাৎ হয়। তিনি কারো কাছে শুনেছিলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পোলাও খান, বাদামের তেল ব্যবহার করেন। সব সময় নয় যখনই হস্তগত হয় বা রান্না হতো খেতেন আর বাদামের তেল ব্যবহার করতেন। সেই হিন্দু তখন নিজের ঘরের বাহিরেই বসে ছিল।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে দেখে সে বলে, মৌলভী সাহেব! আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। মৌলভী সাহেব অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, বলো। সে ব্যক্তি বলে, বাদামের তেল খাওয়া এবং পোলাও খাওয়া কি বৈধ? হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, আমাদের ধর্মে এসব জিনিস খাওয়া বৈধ, কোন বাধা নেই। সেই ব্যক্তি বলে, আমার কথার অর্থ হলো, 'ফকরান'-খাওয়া বৈধ কি না? এই শব্দটি পাঞ্জাবী অর্থাৎ যারা ফকির, দরবেশ এবং যারা আল্লাহ্‌প্রেমী তাদের জন্যও কি খাওয়া বৈধ? যারা বুযূর্গ, যারা পুণ্যবান আখ্যায়িত হয় বা যাদেরকে পুণ্যবান বলা হয় তাদের জন্যও কি এসব খাওয়া বৈধ? তিনি (রা.) বলেন, আমাদের ধর্মে দরবেশ বা ফকির বা যারা বুযূর্গ আখ্যায়িত হয় সবার জন্য তা বৈধ। একথা শুনে সেই ব্যক্তি বলে, আচ্ছা! এটি বলে সে নীরব হয়ে যায়।

হযরত মুসলহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, দেখ! এই ব্যক্তির মাথায় সবচেয়ে বড় যে আপত্তি এসেছে তাহলো হযরত মির্যা সাহেব মসীহ্ এবং মাহ্‌দী কীভাবে হতে পারেন, কেননা তিনি পোলাও খান এবং বাদামের তেল ব্যবহার করেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, সাহাবীদের জ্ঞানগত প্রবণতাও যদি তেমনই হতো যেমনটি আজকাল আহমদীদের মাঝে রয়েছে আর কদু বা লাউয়ের কথা যদি তারা হাদীসে উল্লেখ না করতেন তাহলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা হারিয়ে

ফেলতাম। হাদীসে আছে, মহানবী (সা.) একবার জুমুআর দিন সুন্দর জোব্বা পরিধান করে মসজিদে আসেন। এখন, যদি এমন কোন ব্যক্তির জন্ম হয় আর সে বলে, পীর-ফকিরদের, বুযূর্গদের এবং পুণ্যবানদের বৈশিষ্ট্য হলো, ভাল কাপড় পরিধান না করা; তাহলে আমরা তাকে এই হাদীসের বরাতে বলতে পারি যে, মহানবী (সা.) জুমুআর দিন পুরো সচেতনতার সাথে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা নিতেন এবং উন্নত মানের সুন্দর পোষাক পরিধান করতেন বরং তিনি পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে এতো বেশি যত্নবান ছিলেন বা এমনভাবে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন যে, কোন কোন সূফী যেমন শাহ্ ওলীউল্লাহ্ সাহেব মুহাদ্দিস দেহলভীর রীতি ছিল, তিনি প্রতিদিন নতুন কাপড় পরিধান করতেন, সেই কাপড় বিধৌত হোক বা নতুনই হোক না কেন।

এরপর তিনি (রা.) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর ঘটনা বর্ণনা করেন। খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর স্বভাব ছিল খুব সাদাসিধে। অনেক বিষয়ের প্রতি তাঁর মনোযোগও থাকতো না আর কাজের চাপও অনেক বেশি ছিল তাই অনেক সময় তিনি জুমুআর দিন গোসল করতে বা কাপড় পরিবর্তন করতে ভুলে যেতেন আর পূর্ব-পরিহিত কাপড় পড়েই জুমুআর নামাযে চলে যেতেন। এটি তাঁর অনাড়ম্বর জীবন পদ্ধতি ছিল। পীর-ফকিরদের হাব-ভাব প্রকাশ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না বা এমনটিও নয় যে, পুণ্যবান আখ্যায়িত হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো পোশাক পরিবর্তন না করা! বরং কাজের আধিক্যের কারণে তাঁর মনে থাকতো না।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি যখন তাঁর কাছে বুখারীর পাঠ নেয়া আরম্ভ করি তখন একদিন আমি বুখারী পড়ার জন্য তাঁর কাছে যাচ্ছিলাম। তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাকে দেখেন এবং জিজ্ঞেস করেন, কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম, মৌলভী সাহেবের কাছে বুখারী শরীফ পড়তে যাচ্ছি। তিনি (আ.) বলেন, আমার পক্ষ থেকেও মৌলভী সাহেবকে একটি প্রশ্ন করো, জিজ্ঞেস করো, বুখারীতে কোথাও কি এমন কথা লিখা আছে যে, জুমুআর দিন মহানবী (সা.) গোসল করতেন আর নতুন কাপড় পরিধান করতেন? কিন্তু এখন আমাদের যুগে সুফী মতবাদের কাছে এর অর্থ হলো, মানুষের অগোছালো থাকা।

এটিকে যদি ছন্দের রূপ দেয়া হয় তাহলে হয়তো এভাবে তা লেখা যেতে পারে, 'যিতনা গান্দা উতনাহি খুদাকা বান্দা' অর্থাৎ যত নোংরা থাকবে ততই আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দায় পরিণত হবে। অথচ মানুষ যত অগোছাল এবং নোংরা থাকে ততই সে খোদা থেকে দূরে সরে যায়। সে কারণেই আমাদের শরীয়তে অনেক ক্ষেত্রে গোসল আবশ্যক করা হয়েছে আর সুগন্ধি লাগানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু খেয়ে বৈঠক বা অধিবেশনে বা মসজিদে আসতে বারণ করা হয়েছে। বস্তুত মহানবী (সা.)-এর জীবনাচরণ থেকে পৃথিবীবাসী উপকৃত হয়েছে আর লাভবান হতে থাকবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনাচরণ থেকেও পৃথিবীর মানুষ লাভবান হতে থাকবে। আমাদের কাজ হলো, সেগুলোকে এক জায়গায় সংকলিত করা।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এক যুবক আমাকে বলেছে, 'আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী কিন্তু একথা ছাড়া আমার আর কোন কিছু মনে নেই, যখন আমি এক ছোট্ট বালক ছিলাম, একদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাত ধরি, তার সাথে মুসাহ্‌ফা বা করমর্দন করি আর কিছুক্ষণ তাঁর হাত আমার হাতে নিয়ে বরাবর দাঁড়িয়ে থাকি। কিছুক্ষণ পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর হাত ছাড়িয়ে অন্য কোন কাজে রত হন।' বাহ্যত এটি একটি ছোট্ট কথা কিন্তু পরবর্তী যুগে এসব ছোট-খাটো ঘটনার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল নির্ণয় করা হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই ঘটনাকেই নাও। এটি থেকে একটি বিষয় প্রমাণিত হয়, অল্প বয়স্কদেরকেও পুণ্যবানদের বা বুযূর্গদের মজলিস বা বৈঠকে নিয়ে আসা উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে মানুষ ছোটদের তাঁর (আ.) মজলিসে বা বৈঠকে নিয়ে আসতেন। হয়তো পরবর্তী কোন যুগে এমন মানুষেরও জন্ম হতে পারে যারা হয়তো বলবে, ছোটদেরকে বা শিশুদেরকে বুযূর্গদের অধিবেশনে নিয়ে আসলে লাভ কী। এমন বৈঠকে শুধু বয়স্কদের আসা উচিত। দর্শন যখন আধিপত্য বিস্তার করে তখন এমন অনেক কথার জন্ম হয়, একথা বলা আরম্ভ করা হয়, শিশুদের এখানে কাজ কী? যখনই এমন ধারণা মাথা চাড়া দিবে তখন এই রেওয়ায়েত তাদের এমন ধারণাকে খন্ডন করবে আর এর অতিরিক্ত সমর্থন এভাবে হবে যে, হাদীসে লেখা আছে, মহানবী (সা.)-এর বৈঠকে বা অধিবেশনে সাহাবীগণ নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে নিয়ে আসতেন। অনুরূপভাবে এই ঘটনা বা রেওয়ায়েত থেকে এটিও বোধগম্য হয় যে, যখন কোন কাজ থাকে তখন হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কাজ আরম্ভ করা উচিত কেননা, এতে উল্লেখ আছে সেই বালক যখন তাঁর (আ.) হাত কিছুক্ষণ ধরে রেখেছিল তখন তিনি তাঁর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কাজে রত হন।

আজ এ কথা বাহ্যত তুচ্ছ মনে হয় কিন্তু হতে পারে কোন যুগে মানুষ মনে করবে, বুযূর্গ সে হয়ে থাকে যার হাত কেউ ধরলে তা ছাড়িয়ে নেয়া উচিত নয় বরং দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি তার হাতে হাত রাখে তাহলে প্রথম ব্যক্তির নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত। এমন যুগে এই রেওয়ায়েত বা ঘটনা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি খন্ডন করতে পারে এবং বলতে পারে, এটি বাজে কাজ বা বাজে কথা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজের হাত প্রত্যাহার করেন যা থেকে বুঝা যায়, যদি কোন কাজ করতে হয় তাহলে স্নেহের সাথে অন্যের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নেয়া উচিত, তা সে স্বল্প-বয়স্কই হোক না কেন। এ ধরনের ঘটনা বা রেওয়ায়েত থেকে এমন অনেক বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয়। আজ একথাগুলোর গুরুত্ব আমরা বুঝি না {এটি সে যুগের কথা যখন সাহাবীগণ জীবিত ছিলেন, তখন তাদেরকে তিনি (রা.) এই কথা বলেন} কিন্তু যখন আহমদী ফিকাহ্, আহমদী সূফী মতবাদ আর আহমদী দর্শন গঠিত হবে তখন বাহ্যত এই তুচ্ছ বিষয়ও

গুরুত্বপূর্ণ দলীল বলে আখ্যায়িত হবে।

এগুলোর গুরুত্ব আজও রয়েছে যা অনুভূত হয়। বড় বড় দার্শনিকরা যখন এসব ঘটনা পড়বেন তখন আনন্দে মাতোয়ারা হবেন অর্থাৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে বলবেন, এই ঘটনা বা রেওয়ায়েত বর্ণনাকারীকে আল্লাহ্ পুরস্কৃত করুন। তিনি আমাদের এক জটিল রহস্যের সমাধান উপস্থাপন করেছেন। সমস্যার সমাধানরূপী এমন ঘটনা যখন সামনে আসবে তখন যেসব দার্শনিকের ধর্মের সাথে সম্পর্ক রয়েছে তারা এদিক সেদিক না তাকিয়ে এমন রেওয়ায়েত বা ঘটনা বর্ণনাকারীর জন্য দোয়া করবে। তিনি (রা.) আরো বলেন, এটি এমনই ঘটনা যেমনটি আমরা হাদীসে পড়ি, "মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একবার সেজদায় যান। হযরত হাসান (রা.) যিনি সে সময় এক স্বল্প বয়স্ক বালক ছিলেন তিনি তখন তাঁর (সা.) ঘাড়ে বসে পা ঝুলিয়ে দেন। মহানবী (সা.) ততক্ষণ মাথা তুলেন নি যতক্ষণ তিনি (রা.) নিজে উঠে যান নি।" এখন কেউ যদি নামাযে এ ধরনের গতিবিধি প্রদর্শন করে তাহলে কেউ-কেউ হয়ত তাকে বে-দ্বীন বা বিধর্মী আখ্যা দিবে বা বলবে, এ ব্যক্তির আল্লাহ্‌র ইবাদতের কোন চিন্তা নেই, নিজের সন্তানের আবেগ অনুভূতির প্রতি অনেক বেশি সংবেদনশীল। কিন্তু এমন মানুষ যখনই এই ঘটনা পড়বে সে মানতে বাধ্য হবে, তার ধারণা ভ্রান্ত এবং তার মুখ বন্ধ হয়ে যাবে কেননা, মহানবী (সা.)-এর আদর্শ সামনে রয়েছে। যদিও এমন মানুষও রয়েছে যারা এরপরও মুখ বন্ধ রাখবে না।

যেমন এক পাঠানের কাহিনী রয়েছে, সে কদুরীতে (এটি ঘটনাবলীর একটি গ্রন্থ) পড়েছে, হরকতে সাগীরা বা সামান্য নড়াচড়া করলে নামায নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ নামাযে যদি ছোট-খাট কোন নড়াচড়া হয় তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। এই ঘটনা পড়ার পর অর্থাৎ কদুরীর ঘটনা পড়ার পর সে হাদীস পড়া আরম্ভ করে এবং সেখানে এই হাদীস তার সামনে আসে, মহানবী (সা.) একবার নামাযের সময় তাঁর কোন প্রিয় বালককে কোলে তুলে নেন। রুকু এবং সিজদাতে যাওয়ার সময় তাকে নামিয়ে দিতেন আর যখন দাঁড়াতেন তখন আবার কোলে তুলে নিতেন। এই হাদীস পড়তেই সে বলে উঠে, এভাবে তো মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নামায নষ্ট হয়ে গেছে কেননা, কদুরীতে লেখা আছে, সামান্য নড়াচড়া করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। তাদের দৃষ্টিতে যেন শরীয়ত প্রণয়নকারী ছিল কান্‌য্ বা কদুরীর লেখক, হযরত মুহাম্মদ (সা.) নন। এমন মানুষও থাকতে পারে যারা স্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্যেও তা মানতে অস্বীকার করবে। কিন্তু এমন মানুষের সংখ্যা খুব কমই হয়ে থাকে। অতএব এ কথার প্রতি আদৌ ভ্রুক্ষেপ করা উচিত নয়।

এরপর তিনি (রা.) নসীহত করতে গিয়ে বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যে কথাই তোমার জানা আছে সে কথা যত ছোটই হোক না কেন বরং যত তুচ্ছ কথাই হোক না কেন, এমনকি এতটাও যদি হয় যে, আমি দেখেছি একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হাঁটতে হাঁটতে ঘাসে বসে পড়েছেন– তা-ও বলা উচিত বা বর্ণনা করা উচিত। পরবর্তীতে এই কথাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ অর্থ করা হবে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে আছে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একবার কয়েকজন বন্ধুর সাথে বাগানে যান। তিনি (আ.) বলেন, 'এসো বেদানা খাই (এটি এক ধরনের তুঁত)। তখন কয়েকজন বন্ধু সেখানে চাদর বিছিয়ে দেন। তিনি (আ.) গাছে ঝাঁকুনি দিয়ে বেদানা পাড়েন এরপর সবাই এক জায়গায় বসে বেদানা খান।' অনেক বন্ধু পরে হয়তো এমন আসবে যারা বলবে, নেকী এবং সূফী হওয়ার অর্থ হলো, তৈয়্যব বস্তু না খাওয়া। এমন মানুষকে আমরা বলতে পারি, তোমার কথা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) গাছ থেকে বেদানা পাড়িয়ে খেয়েছেন। অথবা পরবর্তীতে বড় বড় অহংকারী শাসকরা যখন দৃশ্যপটে আসবে, যারা অন্যদের সাথে একত্রে বসে কিছু খেতে সংকোচ বোধ করবে তখন তাদের সামনে আমরা একথা বলতে পারবো, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অকৃত্রিমভাবে বা নিঃসংকোচে বন্ধু-বান্ধবের সাথে একত্রে বসে পানাহার করতেন। তুমি এ বিষয়ে লজ্জা বোধ করার কে? কাজেই কোন কোন কথা ছোট বা তুচ্ছ হলেও পরবর্তী যুগে এগুলোতে বড় গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়ের সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়।

তিনি (রা.) বলেন, যেসব বন্ধুর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর চেহারা দেখা বা তাঁর সাহচর্যে বসার সুযোগ হয়েছে তাদের উচিত সব কথা তা ছোট হোক বা বড় লিখে সংরক্ষণ করা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যদি এমন কোন ব্যক্তি থেকে থাকে যার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পোষাক-আশাকের ধরনের কথা মনে আছে তাঁর তা লিখে পাঠানো উচিত। তিনি (রা.) সে সময় একথাও বলেছেন আর এরপর সাহাবীগণ তাঁদের রেওয়ায়েত বা ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করেন বা সংকলন আরম্ভ করেন। এসব ঘটনা সম্বলিত অগণিত ঘটনাবলীর রেজিস্টার প্রস্তুত হয়ে গেছে। একবার আমি এগুলো আপনাদেরকে শুনিয়েছি। পূর্বে হাতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিলো এখন নতুনভাবে তা কম্পোজ করা হচ্ছে। বইয়ের আকারে ছাপাতে হলেও যেন ছাপতে পারে।

অনেক ঘটনা এমনও আছে বা তাদের অনেকেই যাদের কোন কোন ঘটনার বিরোধ না থাকলেও অন্য অনেক ঘটনার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য দেখা যায় না বা এগুলোর তুলনায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অধিক স্পষ্ট আরো কিছু রেওয়ায়েত রয়েছে। তাই কম্পোজ করার সময় এগুলোকে বাদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু অনেক ছোট ছোট বিষয় এর মাধ্যমে সামনে আসে। আমাদের অনেক কম্পোজকারী আলেম এমন রয়েছেন যারা কোন কোন বিষয়ে সুপারিশ করেন, এগুলো অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন নেই, এর ফলে এই প্রভাব পড়তে পারে, সেই প্রভাব পড়তে পারে। আমি নিজে যখন পড়ি তখন আমি এমন অনেক রেওয়ায়েত বা ঘটনা পড়েছি যে সম্পর্কে এসব

আলেম অপ্রয়োজনীয় সাবধানতা দেখিয়েছেন। এমন রেওয়ায়েত বা সেসব ঘটনাও অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। যাহোক এগুলো একত্রিত বা সংকলিত হচ্ছে। কোন এক সময় জামা'তের সামনে এসে যাবে, ইনশাআল্লাহ্।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এসব রেওয়ায়েত বা ঘটনার একটি উপকারিতা এই হবে, ধরুন পরবর্তী যুগে কোন সময় যদি এমন মানুষ সামনে আসে যারা বলবে, খালি মাথায় থাকা উচিত। বাহ্যত এটি ছোট একটি কথা কিন্তু এর মাধ্যমে এমন লোকদের দৃষ্টিভঙ্গিরও খন্ডন হতে পারে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন হাদীস রয়েছে। এটি একটি সামান্য বিষয়, খালি মাথায় অনেক সময় মানুষ নামায পড়ে। এসব রেওয়ায়েত বা ঘটনার মাধ্যমে এদিকেও মনোযোগ নিবদ্ধ হয় কেননা, এতে অনেক ঘটনা এমনও আছে যাতে মসজিদের আদব, নামাযের রীতি-নীতি, বড় কোন বৈঠকে বা মজলিসে বসার আদব এবং শিষ্টাচার ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন হাদীস রয়েছে আর তিনি শরীয়তধারী বা শরীয়ত প্রবর্তনকারী নবী। কিন্তু এতেও কোন সন্দেহ নেই, নিকটবর্তী যুগের প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির কথা শারে' বা শরীয়ত প্রবর্তনকারী ব্যক্তির সত্যায়ন হয়ে থাকে। আজকাল বলা হয়, ফিকাহ্‌র যেসব বিষয়ের ওপর ইমাম আবু হানীফা সহমত পোষণ করতেন সেগুলো বেশি সঠিক; অনুরূপভাবে আগামীতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যেসব হাদীসকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজ কর্মের মাধ্যমে সত্য আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকেই মানুষ সঠিক হাদীস জ্ঞান করবে আর যেসব হাদীসকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন অর্থাৎ মানুষ বানিয়েছে বা যেসব হাদীসের রেওয়ায়েত সঠিক নয়, মানুষ সেগুলোকে দুর্বল বা মিথ্যা আখ্যায়িত করবে। অতএব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কথাগুলো সেভাবেই গুরুত্বপূর্ণ যেভাবে হাদীস গুরুত্বপূর্ণ কেননা এই কথাগুলো হাদীসের সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের একটি মাপকাঠি হবে।

তিনি (রা.) আরও বলেন, এসব রেওয়ায়েতে নিঃসন্দেহে এমন কোন কোন কথাও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যা সে যুগে অর্থাৎ তাঁর (আ.) যুগে ছাপা হয়তো যুক্তিযুক্ত মনে করা হয়নি কিন্তু সেগুলোর সংরক্ষণ করা হয়েছে। হয়তো এতে এমন কিছু কথাও থাকবে যে কারণে আজও তা ছাপানো যুক্তিযুক্তি হবে না বা প্রকাশ করা হবে না কিন্তু সংরক্ষণ অবশ্যই করা উচিত যা সাহাবীদের বরাতে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। পরবর্তীতে অনুকূল পরিবেশ আসলে তা ছাপানোও যেতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি ইলহাম হয়েছিল, 'সালতানাতে বারতানীয়া তা হাশত্ সাল, বাদ আযাঁ আইয়ামে যো'ফ্ ও ইখতিলাল' অর্থাৎ ইংরেজ সাম্রাজ্যে আট বছর পর পতনের যুগ আসবে।

তিনি (রা.) বলেন, এই ইলহাম তখন ছাপা হয়নি বরং দীর্ঘকাল পর তা ছাপা হয়েছে। কেউ কেউ বলে, এতে রানী ভিক্টোরিয়ার মরনোত্তর যুগের উল্লেখ করা হয়েছে। এর অন্য অর্থও করা যেতে পারে। ইংরেজ সাম্রাজ্য সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত ছিল এরপর ক্রমশঃ দুর্বলও হতে থাকে। এমন নয় যে, হঠাৎ করে দুর্বল হয়ে গেছে, দুর্বলতার জন্যও দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হয়। সেই দুর্বলতার লক্ষণাবলী প্রকাশ পেয়েছে। যাহোক এটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম ছিল যার বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তিনি (রা.) বলেন, এমন ঘটনা রেকর্ডভুক্ত করা উচিত কিন্তু তখন ছাপা উচিত যখন বিপদের সময় কেটে যায়। তিনি (রা.) বলেন, আমি মনে করি এখনও এই কাজটি সম্পন্ন করার সময় আছে। আর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমি যেমনটি বলেছি, এই সমস্ত রেওয়ায়েত বা ঘটনাকে সঠিকভাবে সংরক্ষণের চেষ্টা চলছে।

এই প্রসঙ্গে তিনি (রা.) আরো বলেন, আজ পৃথিবীতে ইমাম বুখারীর কত বড় সম্মান রয়েছে কিন্তু তার সম্মানের কারণ হলো, তিনি অন্যদের কাছ থেকে বিভিন্ন রেওয়ায়েত সংগ্রহ করেছেন। তাই সাহাবীদের সন্তানদের যদি কোন রেওয়ায়েত বা ঘটনা জানা থাকে তাহলে তাদের তা বর্ণনা করা উচিত। এগুলো যদি অন্যান্য রেওয়ায়েতের মাধ্যমে সঠিক প্রমাণিত হয় তাহলে তাও এতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। হতে পারে কোন কোন রেওয়ায়েত পুরোপুরি রেজিষ্টারে আসেনি, সাহাবীদের বংশে বা পরিবারে সেসব ঘটনা বা রেওয়ায়েত পরম্পরা হিসেবে চলে আসছে, তাহলে তারা তা লিখে পাঠাতে পারেন। তিনি (রা.) একথাও বলেন আর এটি সঠিক এবং সত্য কথা, এ সমস্ত রেওয়ায়েত বা ঘটনা বর্ণনাকারীদের জন্য এক যুগে দোয়া করা হবে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের পুরস্কৃত করুন কেননা তারা অনেক সমস্যার সমাধান উপস্থাপন করেছেন।

তিনি (রা.) বলেন, আমি দেখেছি, এমন সময় অজান্তে এমন লোকদের জন্য হৃদয়ে দোয়ার প্রেরণা জাগে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, গতকালই আমি কলীদ-এ-কুরআন (অর্থাৎ একটি বই যার সাহায্যে সহজেই খুঁজে বের করা যায় যে, কুরআনের কোন আয়াত কোথায় আছে) থেকে একটি আয়াত বের করছিলাম। আমার ধারণা ছিল, আয়াতটি খুঁজে পেতে সময় লেগে যাবে কিন্তু কলীদ-এ-কুরআনে তাৎক্ষণিকভাবে আয়াতটি পেয়ে যাই যে কারণে অবচেতন মনেই দু'তিন মিনিট গভীর আন্তরিকতার সাথে এর সংকলকের জন্য দোয়ায় রত হই যেন খোদা তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করেন। তার পরিশ্রমের কারণেই আজ আমি এই আয়াতটি সহজেই পেয়ে গেছি। এসব কাজ এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে। বিভিন্ন বই-পুস্তক বা লিটারেচার কম্পিউটারে পাওয়া যায়। আজকাল বিষয়টি আরও সহজসাধ্য হয়ে গেছে। যারা এসব প্রোগ্রাম বানিয়ে কম্পিউটারে দিয়েছেন তাদের জন্যও আমাদের মন থেকে দোয়া আসে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতিটি কথা নিজের মাঝে এক জ্ঞানগত দিক বা

আঙ্গিক রাখে যা আমাদের জন্য আবশ্যক। আর ব্যবহারিক তরবীয়তের জন্যও তা আবশ্যক কেননা তরবীয়তের অনেক দিক এরফলে সামনে আসে, পবিত্র কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা সামনে আসে, হাদীসে বিবৃত বিষয়গুলো এরফলে সুস্পষ্ট হয়ে যায় আর আমরা উপকৃত হই। যে আহমদীই এটি শুনবে, যার মাধ্যমেই শুনুক, সে সেটি থেকে লাভবান হবে আর অবশ্যই এগুলোর সংকলনকারীদের জন্য দোয়াও করবে। কাজেই এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যে দিকে অনেক সময় মানুষের পুরো মনোযোগ থাকে না। আমার মনে আছে সাহাবীদের ঘটনাবলী যখন বর্ণনা করা আরম্ভ করেছিলাম তখন কিছু মানুষ যারা সাহাবীদের সন্তান, পারিবারিকভাবে বা পরম্পরাগতভাবে যা তাদের বংশে চলে আসছে এমন অনেক ঘটনা বা রেওয়ায়েত তারা লিখে পাঠিয়েছেন। তাদের উচিত হবে এসব রেওয়ায়েত বা ঘটনা যথারীতি লিখে তসনীফে পাঠানো। প্রয়োজনে পরবর্তীতে এডিশনাল ওকালতে তসনীফ ঘটনাবলী যাচাইয়ের জন্য নির্দিষ্ট কমিটির কাছে লিখে পাঠাবেন। এখন আমি আরও একটি ঘটনা বর্ণনা করছি যা আজও অনেক প্রশ্নকারীর বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান দিয়ে থাকে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) শুরু থেকেই ইসলামের উন্নতির জন্য ব্যাকুল ছিলেন। তিনি চাইতেন মুসলমানরা নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থার সংশোধন করুক আর ব্যবহারিক অবস্থার সংশোধনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, খোদা তা'লার ইবাদতের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা, নামায পড়া। তাই তিনি কাদিয়ানের মুসলমানদের জন্য মসজিদে এসে নামায পড়ার একটি পৃথক ব্যবস্থা করেন। এই ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) অ-আহমদীদের কথার খন্ডন করেন। যারা বলতো অর্থাৎ যারা তখন অপবাদ আরোপ করতো আর আজও করে, আহমদীরা মুসলমান নয় এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নাঊযুবিল্লাহ্ কোন নতুন শরীয়তের সূচনা করেছেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তাদের উত্তর দিচ্ছেন, হযরত মির্যা সাহেব অর্থাৎ মসীহ্ মাওউদ (আ.) আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার পূর্বেই এখানকার মুসলমানদের অবস্থা দেখেন যে, তারা নামাযের প্রতি অমনোযোগী। তিনি স্বয়ং লোক পাঠিয়ে তাদের মসজিদে ডাকতে আরম্ভ করেন। মুসলমানরা আপত্তি করে ঠিকই কিন্তু আজও আর সব সময় এই রীতিই চলে আসছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী নামাযের প্রতি অমনোযোগী। তিনি (আ.) লোক পাঠিয়ে মানুষকে মসজিদে ডাকতে আরম্ভ করেন। বেশির ভাগ মানুষ যেহেতু কৃষিজীবি ও দরিদ্র শ্রেণীর ছিল তাই তারা অজুহাত দেখায়, নামায পড়া ধনীদের কাজ, আমাদের কাজ নয়। আমরা দরিদ্র মানুষ আয়-উপার্জন করবো না-কি নামায পড়বো, কায়িকশ্রম করবো নাকি নামায পড়বো? কাজ না করলে উপাস থাকতে হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তখন যে উদ্যোগ নেন তাহলো, তিনি বলেন, ঠিক আছে নামায পড়তে আসলে তোমরা এক বেলার খাবার পাবে। সেই ঘোষণার পর কয়েক দিন খাবারের লোভে পঁচিশ-ত্রিশ জন মানুষ নামাযের জন্য মসজিদে আসতে আরম্ভ করে কিন্তু এরপর আবার তারা অলস হয়ে পড়ে আর শুধু মাগরিবের সময় যখন খাবার বিতরণ করা হতো তখন তারা মসজিদে আসতো। অবশেষে এই ব্যবস্থা বন্ধ করে দিতে হয়।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, দেখ! হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই একাগ্রতা আর আন্তরিকতার উদ্দেশ্য হলো, ইসলামের সত্যিকার চিত্র তুলে ধরা। আর তাঁর এই আগ্রহ এবং একাগ্রতা দেখে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ করেছেন। আর এখন অর্থাৎ যখন একথা বলেছেন তখন কাদিয়ানে চারটি মসজিদ রয়েছে যার মাঝে দু'টো তো অনেক বড় আর পাঁচবেলা এখানে নামায হয় এবং নামাযীতে পরিপূর্ণ থাকে।

অতএব একথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, এই যে ব্যাকুলতা যা দাবীর পূর্বেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে বিরাজমান ছিল, এর প্রতি তাঁর দাবির পূর্বেও এবং দাবির পরেও বারংবার তিনি মনোযোগ আকর্ষণ করেন, নামাযের দিকে আসো, জামা'তবদ্ধভাবে নামায পড়, মসজিদ আবাদ কর। এখন পৃথিবীর সর্বত্র আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমাদের মসজিদ নির্মিত হচ্ছে কিন্তু মসজিদ আবাদ করার প্রতি যেভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত তেমন মনোযোগ নেই। অনেক স্থান থেকেই অভিযোগ আসে। অনুরূপভাবে রাবওয়ায়, কাদিয়ানে, পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় আহমদীদের উচিত মসজিদ আবাদ করার প্রতি মনোযোগ দেয়া। একইভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও মসজিদগুলো আবাদ করার প্রতি মনোযোগ দেয়া উচিত। দ্বিতীয়ত এ আপত্তিরও এখানে খন্ডন দেখা যায়।

অনেকেই আমাকে লিখে, যুবকদেরকে মসজিদমুখী করার জন্য তারা সেখানে খেলাধূলার ব্যবস্থা করেছেন যেন ছেলেরা সন্ধ্যায় এসে খেলতে পারে। এভাবে খেলার লোভ দেখিয়ে নামায পড়ানো এটি তো এমন কোন পুণ্যের কাজ হলো না। অনুরূপভাবে কেউ কেউ বলে, কোন কোন অনুষ্ঠানে খাবারের ব্যবস্থা থাকে। মানুষ অনুষ্ঠানে আসে বা নামায পড়তে আসে খাবারের টানে। এটি একটি কু-ধারণা যা কেউ কেউ পোষণ করে থাকে। কিন্তু মসজিদের সাথে যেখানে হল নির্মিত হয়েছে বা যেখানে মুরুব্বী বা মুবাল্লিগ রয়েছেন যারা নিজেরাও যুবক এবং খেলাধূলাও করেন, মাঠে খেলাধূলার মাধ্যমে যুবকদের সমবেত করা আরম্ভ করেন। এরফলে একটি উপকারী দিক তো অবশ্যই সামনে আসছে, অন্ততঃপক্ষে দু'এক বেলা এই দিকে যুবকদের মনোযোগ নিবদ্ধ হয় এবং মসজিদ আবাদ হয়। তাই একথা বলা যে, এটি কোন অপরাধ বা মসজিদের সাথে খেলার হল কেন বানানো হয়েছে বা মসজিদে আনার জন্য বা কোন অনুষ্ঠানে আনার জন্য খাবারের ব্যবস্থা কেন করা হয়েছে এগুলো অমূলক আপত্তি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আমল থেকে প্রমাণিত হয় যে,

এমনটি হতে পারে এবং এমনটি করলে কোন অসুবিধা নেই।

নামাযের পর এখন আমি দু'জনের গায়েবানা জানাযা পড়াব। একটি হলো আলহাজ্জ ইয়াকূব বিন সাহেবের যিনি ঘানা নিবাসী। ২০১৫ সনের ৩০শে আগষ্ট তিনি ইন্তেকাল করেছেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। এক ধারণা অনুসারে তার বয়স ছিল শতাধিক বছর। মধ্য ঘানার সাথে তার সম্পর্ক। তার দাদা খ্রিস্টান ছিলেন কিন্তু তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন। দ্বিতীয় বিয়ে করার পর প্রেসপিটেরিয়ান গীর্জা তাকে চার্চ থেকে বহিষ্কার করে। এই কারণে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একত্ববাদী হয়ে খোদার ইবাদত আরম্ভ করেন। এরপর তার দাদা অর্থাৎ আলহাজ্জ ইয়াকূব সাহেবের দাদা ইব্রাহীম উদোবো সাহেব হজ্জে যাওয়ার জন্য অর্থকড়ি জমান। এরপর তিনি আহমদীয়াতও গ্রহণ করেন। যখন অর্থ জমা করেন তখন তিনি আহমদী ছিলেন। তিনি সল্টপন্ড পৌঁছলে সেখানকার মুবাল্লিগ ইনচার্জ তাহরীক করেন, আজকাল হেডকোয়ার্টার নির্মীত হচ্ছে এর জন্য আমরা চাঁদা সংগ্রহ করছি। তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে যে টাকা জমিয়েছিলেন তা মসজিদ এবং হেডকোয়ার্টার নির্মাণের জন্য হস্তান্তর করেন। এরপর খোদা তা'লা তাকে এত দীর্ঘায়ু দিয়েছেন, দীর্ঘকাল পর তার পৌত্রকে তিনি নিজের খরচে হজ্জ করিয়েছেন।

আলহাজ্জ ইয়াকূব সাহেব অত্যন্ত পরিশ্রমী, কুরবানী ও ত্যাগের চেতনায় সমৃদ্ধ একজন মানুষ ছিলেন। মৌলভী আব্দুল ওয়াহাব আদম সাহেব যখন ঘানার আমীর মনোনীত হন তখন খলীফা সালেস (রাহে.) তাকে সেখানে পাঠান এবং ঘানা মিশনের তবলীগের কাজকে বেগবান করার জন্য তাকে নসীহত করেন। আলহাজ্জ ইয়াকূব সাহেব তখন দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্ বা তবলীগকারীদের জন্য একটি গাড়ি উপহার দেন। যাতে লেখা থাকতো 'আহমদীয়া মুসলিম প্রিচার এসোসিয়েশন' অর্থাৎ আহমদীয়াত প্রচারকারীদের সংগঠন। তিনি এর মাধ্যমে অনেক তবলীগি অনুষ্ঠান করেছেন। তার আরো একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, যেখানে জামা'ত গঠিত হতো এবং নতুন বয়আতকারীরা সমবেত হতো সেখানেই নিজের খরচে মসজিদ নির্মাণ করতেন। তিনি ওয়াকেফে যিন্দেগী এবং মুবাল্লিগদের কল্যাণের প্রতিও গভীর মনোযোগী ছিলেন। তার দুই পুত্রও ওয়াকেফে যিন্দেগী। একজন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ ইব্রাহীম বিন ইয়াকূব সাহেব যিনি ত্রিনিদাদে আমাদের মুবাল্লিগ ইনচার্জ এবং আমীর আর দ্বিতীয়জন সেখানকার স্থানীয় মুবাল্লিগ নূরুদ্দীন বাবিন সাহেব, যিনি উত্তরাঞ্চলে জামা'তের সেবার সুযোগ পাচ্ছেন।

আলহাজ্জ বাবিন সাহেব রাবওয়াও গিয়েছেন। মূসী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তার হিস্যায়ে জায়েদাদ এবং হিস্যায়ে আমদ পরিষ্কার ছিল অর্থাৎ পরিশোধ করে দিয়েছেন। আমি যখন ঘানায় ছিলাম তখন আমি দেখেছি, তিনি বড় নিবেদিতপ্রাণ দাঈ ইলাল্লাহ্ ছিলেন। সবসময় তবলীগের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। তিনি হাসিখুশি থাকতেন। একই সাথে অসাধারণ বিনয়ীও ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তান-সন্ততি ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তার পুণ্যকাজ গুলোকে ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হবে আমাদের জামা'তের দীর্ঘকাল খিদমতকারী জনাব মৌলানা ফযলে ইলাহী বশীর সাহেবের। কোন কারণে তার জানাযা পড়া সম্ভব হয়নি দাপ্তরিক ভুল বোঝাবুঝির কারণে। তিনি ৩রা আগষ্টে ৯৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। ১৯১৮ সনে তার জন্ম হয় জনাব চৌধুরী করম ইলাহী চিমা সাহেবের ঔরসে। মৌলভী সাহেব ১৯৪৪ সনের ২৪শে নভেম্বর জীবন উৎসর্গ করেন। ৩রা জুন, ১৯৪৪ সনে কাদিয়ান পৌঁছেন। ১৯৭৮-এ রীতিমত অবসর গ্রহণ করেন কিন্তু ১৯৯৩ পর্যন্ত রিএমপ্লয় হতে থাকেন এবং জামা'তের কর্মী হিসেবে রীতিমত জামা'তের কাজ অব্যাহত রাখেন। বরং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে জামা'তের অনেক কাজ করেছেন। বিশেষ করে প্রুফ রিডিং ইত্যাদির কাজ অব্যাহত রাখেন।

লিখা হয়েছে, তার পিতা করম ইলাহী সাহেব ১৮৯৮ সনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছেন। এক বছর পর তার দাদা চৌধুরী জালালুদ্দিন সাহেবও বয়আত করেন। জামা'ত এবং খিলাফতের সাথে তার পিতার সম্পর্ক অনেক সুদৃঢ় ছিল আর খোদা তা'লাও তাকে পথের দিক-নির্দেশনা দিতেন। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর তাৎক্ষণিকভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর হাতে বয়আত করেন আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর ইন্তোকালের পর অনতিবিলম্বে দ্বিতীয় খলীফার হাতে বয়আত করেন বরং তাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, ইনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী অর্থাৎ হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ পরবর্তী খলীফা। তিনি ওসীয়্যত করেছেন বরং এক অষ্টমাংশ ওসীয়্যত করেছেন।

নিজের জীবন উৎসর্গ করার ঘটনা মৌলভী সাহেব নিজেই বর্ণনা করেন, তার মা তাকে শুনিয়েছেন, আমি কোলে ছিলাম মনে হয় ১৯১৯ বা ২০ সনের কাদিয়ানের সালানা জলসা ছিল। মহিলাদের জলসাগাহে হযরত হাফেয গোলাম রসূল উযীরাবাদী সাহেব বক্তৃতায় বলেন, হে ভদ্রমহিলাগণ! আমরা এখন প্রৌঢ়। তিনি সাহাবী ছিলেন। ধর্মের খিদমতের জন্য আমাদের এমন লোকদের প্রয়োজন যারা আমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে ধর্মের খিদমতের জন্য উৎসর্গ কর। তাদেরকে পড়ালেখার জন্য কাদিয়ান পাঠাও। সেই বক্তৃতাকালে আমার মা আল্লাহ্ তা'লার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন আর দোয়া করেন, এই সন্তান ফযলে ইলাহীকে খোদার পথে উৎসর্গ করব। ১৯৩১ সনে যখন তিনি মাধ্যমিকে ভর্তি হন তখন তার পিতা তাকে মায়ের এই অঙ্গীকার সম্পর্কে অবহিত করে বলেন, যদি জাগতিক পড়ালেখা অব্যাহত রাখতে চাও তাহলে শিক্ষা শেষে আমার এমন পজিশন আছে যে, আমি তোমাকে তহশীলদারের পদ পাইয়ে দিতে পারি। এটি সেযুগে অনেক

বড় একটি সম্মানজনক পদ ছিল। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বলেন, আমি ওয়াক্‌ফ করে কাদিয়ান যেতে চাই।

১৯৪৭ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তিনি অন্যান্য মুরুব্বীর সাথে পূর্ব আফ্রিকার মোম্বাসা বন্দরে পৌঁছেন। এসব মুরুব্বীর মাঝে মীর যিয়াউল্লাহ্ সাহেব, মৌলভী জালাল উদ্দীন ক্বমর সাহেব, সৈয়্যদ ওলীউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব, হাকীম মুহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব, মুহাম্মদ এনায়েতউল্লাহ্ সাহেব প্রমূখ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর পূর্ব আফ্রিকায় মুবাল্লিগ ইনচার্জ ছিলেন, শেখ মুবারক আহমদ সাহেব। দীর্ঘকাল তাঁর কেনিয়া, সুরিনাম, গায়ানা, ইরান ইত্যাদি স্থানে মুবাল্লিগ হিসাবে খিদমতের সুযোগ হয়েছে। এরপর কেন্দ্রীয় বিভিন্ন অফিসে আঞ্জুমান এবং তাহরীকে জাদীদে সেবা অব্যাহত রাখেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) ওসীয়্যতের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অভিনিবেশ এবং প্রণিধানের জন্য যে কমিটি গঠন করেন মৌলভী সাহেবও সেই কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি আরবী, ইংরেজী এবং ফ্রেঞ্চ ভাষায় প্রায় এগারটি বই-পুস্তক লিখেছেন। তিনি দু'টি বিয়ে করেছিলেন। প্রথমটি চৌধুরী মুহাম্মদ দ্বীন সাহেবের কন্যার সাথে যিনি শিয়ালকোটে সাহী ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন মরিশাসে।

দোয়া গৃহীত হওয়া সংক্রান্ত শৈশবের একটি ঘটনা তিনি শোনান। একবার যখন তার বয়স দশ বা বারো বছর ছিল তার মা প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন এমনকি জীবনের কোন আশাই ছিল না। তিনি বলেন, মা মারা যাবেন এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি নিরাশ হয়ে যাই। আমি দোয়া করি, হে আল্লাহ্! এই বয়সেই কি আমাকে মায়ের ছায়া থেকে বঞ্চিত করবে? এই দোয়ার পর কয়েক মিনিট অতিবাহিত হতেই আমার পিতা ঘর থেকে বেরিয়ে আমার দিকে আসেন এবং আসতেই বলেন, ফযল ইলাহী! তোমার মা সুস্থ হয়ে গেছেন।

তিনি কাবাবীরেও ছিলেন (ফিলিস্তিনে)। শরীফ অওদা সাহেব লিখেন, তিনি ১৯৬৬ থেকে ৬৮ আর ১৯৭৭ থেকে ৮১সাল পর্যন্ত তিনি ফিলিস্তিনে কাজ করেছেন। কাবাবীরে অবস্থানকালে তবলীগ এবং তরবীয়তের কাজ কঠোর পরিশ্রম এবং একাগ্রতার সাথে করতেন। মানুষের ঘরে গিয়ে দরস এবং কুরআনের তফসীর সংক্রান্ত দরস দিতেন। কাবাবীরে আহমদীয়া স্কুলের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। বহু তবলীগি ট্যুর বা সফর করতেন। বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে জামা'তী লিফলেট বিতরণ করতেন। তিনি বলেন, আমি ছোট ছিলাম। তার সাথে বিভিন্ন তবলীগি সফরে যেতাম। অনেক কিছু শিখেছি তার কাছ থেকে।

মরহুম অসাধারণ পরিশ্রমী এবং ধর্মের খিদমতের এক জ্বলন্ত উদাহারণ ছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইলহাম 'আনতা শাইখুল মসীহুল্লাযি লা ইয়ুযাউ ওয়াক্তুহু' ইলহামকে সবসময় দৃষ্টিপটে রাখতেন। কখনও নিজের সময় নষ্ট করতেন না। সেখানে একটি পত্রিকা আল-বুশরাও তিনি প্রকাশ করতেন। আর নিজেই এর সব কাজ করতেন। নিজেই কম্পোজ করতেন, নিজেই লিখতেন এবং ছাপতেন। সব কাজ একাই করতেন। কাবাবীরের মসজিদের সূচনাও তার হাতেই হয়েছে। মসজিদের প্রথম ভিত্তি প্রস্তরও তিনি নিজ হাতে রেখেছিলেন।

একবার তিনি বলেন, ১৯৪০ সনে তার পিতা হযরত করম ইলাহী সাহেব যখন অবসর গ্রহণ করেন তখন ঘরে অনেক অসচ্ছলতা দেখা দেয়। এমনকি যখন কাদিয়ানে পড়তেন তখন মাদ্রাসা আহমদীয়ার ফিস পরিশোধ করাও সম্ভব হয়নি। একবার প্রিন্সিপাল সাহেবের পক্ষ থেকে নোটিস পান, ইনি আসলে মাদ্রাসা আহমদীয়ার হেডমাস্টার ছিলেন, বলেন, সাত দিনের মধ্যে ফিস জমা কর নতুবা মাদ্রাসা থেকে বের করে দেয়া হবে। এরপর তিনি মাদ্রাসায় যাওয়া বন্ধ করে দেন। কিছুদিন পর হযরত মির্যা নাসের আহমদ সাহেব খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) তাকে ডেকে বলেন, মাদ্রাসায় কেন আসছো না? তিনি বলেন, ফিস দিতে পারছি না তাই লজ্জার কারণে আসা বন্ধ করে দিয়েছি। হযরত মির্যা নাসের আহমদ সাহেব বলেন, ফিসের ব্যবস্থা আমি করছি। তিনি বলেন, আমি সদকা নিব না, আমাকে ঋণ দিন। এভাবে তিনি নিজের পড়াশুনা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু ১৯৪০ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত দারিদ্রের কষাঘাতে যখন চরমভাবে জর্জরিত ছিলেন। তখন অনাহার যাপন করতে হতো।

তিনি বলেন, একবার অবস্থা এমন হয়েছে যে, প্রায় ছাপ্পান্ন ঘন্টা পর্যন্ত খাবার কিছুই পাইনি আর কাউকে জানাইওনি। ছাপ্পান্ন ঘন্টা পর একবন্ধু বলেন, আজকে আপনি আমার সাথে খাবার খান। এভাবে ছাপ্পান্ন ঘন্টা পর আল্লাহ্ তা'লা তাকে একটি রুটি খাইয়েছেন। আর এই একটি রুটি খাওয়ার পর পুনরায় আটচল্লিশ ঘন্টা অনাহারে কাটিয়েছেন। তিনি বলেন, এই যে অনাহার যাপন এটি হয়তো আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সহ্যশক্তির জন্য প্রশিক্ষণস্বরূপ ছিল। তবলীগের সমস্যার সময় এটি আমার কাজে এসেছে। তবলীগের সমস্যার কথাও উল্লেখ করেছেন। অনেক সময় আফ্রিকান বন্ধুদের সাথে তবলীগি সফরে যেতেন। তখন অনাহারে কাটাতে হতো। কখনও ভাল খাবার হস্তগত হতো আর যা পেতেন তাই খেয়ে নিতেন। কখনো এই কথা ভাবেননি, আমরা ধর্মের অনেক খিদমত করছি। এটি আজকের ওয়াকেফে যিন্দেগীদের সামনে রাখা উচিত। এখন তো আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সর্বত্র অবস্থা অনেক ভাল। এখন আর কাউকে অনাহারে থাকতে হয় না।

তিনি সারা জীবন খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করেছেন। মাধ্যমিকের পর জীবন উৎসর্গ করেন। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন, ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিব। তার পৌত্রী লিখেছেন, দাদাজান তবলীগের সময় যেসব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন তা খুব কমই বলতেন কিন্তু একটি কথা তিনি বলেছেন, যখন তবলীগের জন্য যেতাম সকাল বেলা দু'টো রুটি বানিয়ে নিতাম। একটি সকালে খেতাম আর অপরটি সাথে করে নিয়ে যেতাম। রাস্তায়

কোন জায়গায় পানি বা চায়ের সাথে খেয়ে নিতাম। আফ্রিকায় যখন ছিলেন সেখানকার মানুষও এর সত্যায়ন করেছেন, এভাবে দু'টো রুটি বানাতেন আর তবলীগের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে যেতেন।

সুরিনামের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, ১৯৭০ থেকে ৭২ পর্যন্ত গিয়ানার মুবাল্লিগ হিসেবে খিদমত করার সৌভাগ্য হয়েছে তার। সুরিনামের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকবার সফর করেছেন। ১৯৭১ সনের ২৫শে এপ্রিল জামা'তের প্রথম ঐতিহাসিক মসজিদের উদ্বোধনের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি বড় প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে এখানে সময় কাটিয়েছেন। সেখানে লাহোরীদের সংখ্যা অনেক বেশি, লাহোরীদের বিরোধিতা ছাড়াও, সুরিনামে জামা'তের ভেতর খাজা ইসমাঈলের একটি দল গড়ে উঠে যারা অনেক সমস্যা সৃষ্টি করেছে তাঁর জন্য। তারা সকল চেষ্টা করেছে মসজিদের জমি যেন জামা'তের নামে স্থানান্তরিত না হয়। তিনি খুবই বীরত্বের সাথে সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছেন এবং গভীর একাগ্রতার সাথে জামা'তের সেবায় রত ছিলেন।

সত্যের বাণী প্রচারের পাশাপাশি কেন্দ্রকে জামা'তের অবস্থা সম্পর্কে রীতিমত অবহিত করতে থাকেন। ১৯৭২ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-কে তিনি লিখেন, সুরিনামে মসজিদ এবং মিশন হাউসের মাধ্যমে জামা'তের একটি কেন্দ্র হস্তগত হয়েছে কিন্তু গায়ানায় এখন পর্যন্ত কোন কেন্দ্র নেই। তারা কেন্দ্র থেকে বঞ্চিত অথচ বারো বছর ধরে সেখানে জামা'তের মুবাল্লিগ রয়েছে। এই কারণে আমার হৃদয়ে গভীর আকাঙ্খা জাগে, সেখানেও মসজিদ চাই চাই। মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব লেখেন, বিশেষ পরিস্থিতিতে মরিশাসে তাকে নিযুক্ত করা হয়, ১৯৫৪ সনে কিছু মানুষ জনাব বশীরুদ্দিন উবায়দুল্লাহ্ সাহেবের কথা মানতে অস্বীকার করলে সেখানে জামা'ত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক অংশ ইতায়াত থেকে সরে যেতে থাকে এবং তারা নিজেদের পৃথক সংগঠন গড়ে তুলে। তিনি সে সময় ফিলিস্তিনে ছিলেন, তখন দ্বিতীয় খলীফা (রা.) তাকে সংবাদ পাঠান, অনতিবিলম্বে মরিশাস পৌঁছুন। তিনি মরিশাস পৌঁছেন। তার বিরুদ্ধে ইমিগ্রেশনে অভিযোগ করা হয় কিন্তু তার কাছে যেহেতু বৃটিশ নাগরিকত্ব ছিল তাই সরকার তাকে দেশে প্রবেশ করার অনুমতি দিতে বাধ্য হয়। তিনি বড় প্রজ্ঞার সাথে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে মুনাফিকদের বা মুর্তাদদের যেই নিয়ন্ত্রণ ছিল সেই পরিস্থিতিতে মসজিদে যান এবং নামায পড়ানো আরম্ভ করেন আর ধীরে ধীরে বয়আতকারীদের পুনরায় মসজিদে একত্রিত করতে আরম্ভ করেন। সে যুগেই মরিশাসে তিনি দ্বিতীয় বিয়েটি করেন। এখানে তিনি ফ্রেঞ্চ ভাষায় কিছু বই-পুস্তকও লিখেছেন যা আমি পূর্বেই বলেছি। এভাবে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় জামা'তকে তিনি পরীক্ষার হাত থেকে রক্ষা করেন এবং নতুনভাবে জামা'তকে এক হাতে ঐক্যবদ্ধ করেন।

মসজিদ মুবারকে জুমুআ পড়ার ব্যাপারে তার ভেতর গভীর আগ্রহ দেখা যেত। জুমুআয় যাওয়ার জন্য একজনকে তিনি বলে রেখেছিলেন, আমাকে তোমার গাড়িতে করে নিয়ে যেও; তার যেন কষ্ট না হয় এবং তাকে যেন অপেক্ষা করতে না হয় এজন্য তিনি ঘরের দরজার বাইরে চেয়ার পেতে বসে থাকতেন যেন সে আসামাত্রই তার সাথে চলে যেতে পারেন। দরিদ্রদের সাধ্য অনুসারে সাহায্য করতেন। একবার এক গরীব মানুষ লিখে, আপনি আমার সন্তানের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করেন। এবার তার কিছু বেশি টাকার প্রয়োজন। তাই আপনি মানি অর্ডারে কিছু বেশি টাকা পাঠিয়ে দেবেন। তিনি ঘরে কাউকে কখনও তা বলেননি। ঘটনাক্রমে তার পুত্রবধূর হাতে একটি চিঠি আসে আর তখনই একথা জানা যায়, তিনি নীরবে মানুষকে সাহায্য করতেন। তার পুত্রবধূ বলেন, একবার তাকে বললাম, বহির্বিশ্বে তবলীগের কোন ঘটনা শোনান। তিনি বলেন, আজকে একটি ঘটনা তোমাকে শুনাচ্ছি।

তিনি বলেন, আমার রীতি ছিল প্রত্যেক দিন ফজরের নামাযের পর কিছুটা অন্ধকার থাকতেই আমি তবলীগের জন্য বেড়িয়ে যেতাম আর সন্ধ্যার সময় ফিরে আসতাম। একদিন সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফিরে আসি তখন দেখি, অনেক মানুষ আমার ঘরের সামনে সমবেত। আমার কিছুটা চিন্তা হলো, আল্লাহ্ মঙ্গল করুন! এরা আমার অপেক্ষায় কেন দাঁড়িয়ে আছে। তারা দূর থেকেই বলতে আরম্ভ করে, মৌলানা সাহেব! আপনাকে অভিনন্দন। আমি বললাম, কিসের অভিনন্দন জানাচ্ছ? তারা বলে, আপনি আজ সকালে যখন যাচ্ছিলেন তখন একটি সিংহ এবং আপনি এক সাথে হাঁটছিলেন। একবার সিংহ আপনার সামনে আর আপনি সিংহের পিছনে আর আরেকবার আপনি সিংহের সামনে আর সিংহ আপনার পিছনে ছিল কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে নিরাপদ রেখেছেন। এজন্য আমরা আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। অনেকেই জঙ্গলে বা অরণ্যে কাজ করার সময় তাকে এভাবে দেখেছে।

তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন। বিগলিতচিত্তে নামায পড়তেন। আরও অনেক মুবাল্লিগ তার জীবনের বিভিন্ন কথা লিখে পাঠিয়েছেন। তিনি সত্যিকার অর্থে খোদার ওপর নির্ভরকারী মুতাওয়াক্কেল একজন মানুষ ছিলেন। দৃঢ়চেতা, ধৈর্যশীল, গভীর ধর্মানুরাগী, ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্যদাতা ছিলেন। যে কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তাতে কোন অতিরঞ্জন নেই। খিলাফতের সাথে তার সুগভীর সম্পর্ক ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তান সন্ততিকে পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।

কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-৩৯)

ওফাতে ঈসা (আ.) সংক্রান্ত বাইবেলের সাক্ষ্য-প্রমাণ ঃ

যীশুখৃষ্ট ক্রুশে মরেন নাই। তিনি ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পর্বত-গহ্বরে থাকার পর জ্ঞান লাভ করে জেরুযালেম থেকে হিজরত করতঃ প্রাচ্যদেশে আগমন করেন। অত:পর তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্ম-প্রচার করার পর কাশ্মীরের শ্রীনগরে অবস্থান কালে পরিণত বয়সে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। (পবিত্র কুরআনের এবং হাদীসের আলোকে এই বিষয়ে পরে অকাট্য সাক্ষ্য–প্রমাণ উল্লেখ করা হবে)। এই পর্যায়ে ইহুদী ও খৃষ্টানদের জন্য এই বিষয়ে বাইবেল এবং ইতিহাস-ভিত্তিক কতিপয় সাক্ষ্য-প্রমাণ-মুলক বরাত এবং উদ্ধৃতি নীচে উল্লেখ করা হলো।

(১) একটি ঐশী নিদর্শনের পূর্ণতার সাক্ষ্য ঃ

কয়েকজন লোক মোজেযা দেখানোর দাবী করলে যীশু ভবিষ্যদ্বাণী করেন : "এ যুগের দুষ্ট-প্রকৃতি ও ব্যভিচারী লোকেরা নিদর্শনের অন্বেষণ করে, কিন্তু তাদেরকে যোনা (ইউনুস-আঃ) ভাববাদীর নিদর্শন ছাড়া আর কোন নিদর্শন দেখানো হবে না। যোনা যেমন তিন দিবারাত্রি বৃহৎ মৎসোর উদরে ছিলেন, তেমনি মনুষ্য–পুত্রও তিন দিবারাত্রি পৃথিবীর গর্ভে অবস্থান করবেন।" (মথি. ১২ঃ ৩৯-৪০; যোনা ১ঃ১৭, ২ঃ১০, ৩ঃ২)।

এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যীশুখৃষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর তিন দিবারাত্রি পর্বত-গুহায় অবস্থান করার পর সুস্থ হয়ে বাইরে এসেছিলেন।

প্রশ্ন হলোঃ এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হয়ে থাকলে যীশুর সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয় কি না ? ফলতঃ যীশুর জীবনে যোনার অনুরূপ ঘটনা অবশ্যই সত্য।

(২) ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যীশুর অভিশপ্ত মৃত্যু হতে পারে না

তওরাতের বর্ণনানুযায়ী ইহুদীগণের ধারণা ছিল যে, হযরত ইলিয়াস ('এলীয়' বা 'এলিজা') আকাশে অবস্থান করছেন এবং তাঁর পূণরাগমনের পুর্বে যীশুর আগমনের দাবী সত্য হতে পারে না। তাই তাঁরা যীশুকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করার জন্য তওরাতের নির্ধারিত শাস্তি অনুযায়ী তাঁকে ক্রুশীয় মৃত্যু দ্বারা লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করেছিল ঃ

"যে ব্যক্তি ক্রুশে টাঙ্গানো অবস্থায় মারা যায়, সে ঈশ্বরের কাছে অভিশপ্ত হয়" (দ্বিতীয় বিবরণ-২১ ঃ ২, গালাতীয়-৩ ঃ ১৩)।

"জেনে রাখ ! আমি এলীয় নবীকে মহা ভীতিপ্রদ দিবসের আগমনের পূর্বে প্রেরণ করবো " (মালাকী, ৪ ঃ ৫)।

যীশু বলেছিলেন যে, এলীয় নবীর পুনরাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী হযরত ইয়াহিয়া (অর্থাৎ যোহন)–এর মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছেঃ

"তিনি (যোহন) আগমন করবেন এলীয় নবীর আধ্যাত্মিকতা এবং শক্তিসহ তাঁর (যীশুর) পূর্বে।" (লুক–১ঃ১৭)।

"সেই 'এলীয়' নিশ্চয়ই আবির্ভূত হয়েছেন..... তখন অনুচরগণ বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাদেরকে শিক্ষাদাতা যোহন নবীর কথা বলেছেন।" (মথি–১৭ঃ১০–১৩)।

"তোমরা যদি গ্রহণ করতে সম্মত হও, তবে জানিবে যে, যোহনই (ইয়াহিয়াই) এলীয়। (মথি ১১ঃ১৪)।

ফলতঃ ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যীশুর অভিশপ্ত-মৃত্যু হতে পারে না। রূপকভাবে–এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে পারে, আক্ষরিকভাবে নয়। দৃষ্টান্ত–স্বরূপ, এলীজার দ্বিতীয় আগমন যোহনের দ্বারা পূর্ণ হয়েছে। প্রশ্ন হলোঃ ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যীশুর মৃত্যু হতে পারে কি? এরূপ মৃত্যু হলে হযরত ঈসা (আঃ) মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত হবেন (নাউযুবিল্লাহ) এবং অস্বীকারকারী ইহুদী পন্ডিতরাই সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

(৩) যীশুর প্রতি বিচারক পীলাতের সু-ধারণা এবং পীলাতের স্ত্রীর সুপারিশঃ

যীশুর বিরুদ্ধে উগ্রবাদী ইহুদী আলেমগণ নানাভাবে ষড়যন্ত্র করতঃ শেষ পর্যন্ত তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করলো (মথি–২৭ঃ১; যোহন–৫ঃ১৮; লুক–২৩ঃ১–২)। আদালতের বিচারক 'পিলাত' জানতেন যে, যীশু ছিলেন নিরাপরাধ, তাই তিনি যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন যাতে যীশুকে বাঁচানো যায়।

"পিলাতের স্ত্রী যীশুর নিরাপরাধ হওয়া সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখে ভীত হয়ে পীলাতের কাছে একটি পত্র লিখে আদালতে প্রেরণ করেছিলেন"(মথি–২৭ঃ১৯)।

প্রশ্ন হলোঃ বিচারক কর্তৃক দন্ড-প্রদানে বিলম্ব করা এবং আরো কতকগুলো বিষয়, যা বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর তাৎপর্য কি?

(৪) যীশু বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলেন

যীশুকে ক্রুশে দেওয়ার আগে এবং পরেও সিরকা ও মদ জাতীয় পানীয় পান করতে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তিনি বেহুঁশ থাকেন এবং তাঁর কষ্ট কম হতে পারে (মথি-২৭ঃ৪৮, যোহন-১৯ঃ২৯)।

প্রশ্ন হলোঃ বর্তমান খৃষ্টানগণ এই বিষয়গুলো অস্বীকার করতে পারবেন কি?

(৫) যীশুর কাতর প্রার্থনা অবশ্যই গৃহীত হয়েছিলঃ

অভিশপ্ত মৃত্যু হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য যীশু কাতরভাবে প্রার্থনা করলেনঃ "আমার কাছ থেকে এই পান-পাত্র দূর কর; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হোক, তোমার ইচ্ছামত হোক।" (মার্ক-১৪ঃ৩৬১)।

ক্রুশে দেওয়ার ব্যাপারে যীশু উচ্চঃস্বরে প্রার্থনা করেছিলেনঃ "এলী এলী, লামা সবক্তাণী"- "আমার ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করেছো? (মথি-২৭ঃ৪৬)।

প্রশ্ন হলোঃ যীশুর সকাতর প্রার্থনার উত্তরে ঈশ্বর কি বলেছেন যে, আদমের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ যীশুকে ক্রুশের শাস্তি পেতেই হবে? একথার উত্তর যীশু স্বয়ং দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, ঈশ্বর তাঁর এই প্রার্থনাগুলো মঞ্জুর করেছিলেনঃ "আর আমি জনতাম, তুমি সর্বদা আমার কথা শুনে থাক।" (যোহন-১১ঃ৪০)। ফলতঃ যীশুর কাতর প্রার্থনা অবশ্যই গৃহীত হয়েছিল এবং তিনি ক্রুশে মারা যান নাই এবং আকাশেও যান নাই।

(৬) কীলক-বিদ্ধ অবস্থায় যীশু মাত্র তিন ঘন্টা ক্রুশে ছিলেনঃ

যীশুর সঙ্গে ক্রুশপ্রাপ্ত আরও দুই ব্যক্তি তখনও জীবিত ছিল (যোহন-১১ঃ৩২)। সেদিন ভয়ংকর ভূমিকম্প এবং তুফান এসেছিল (মথি ১৭ঃ৫৫,২৫)। শুক্রবার বিকালে সূর্যাস্তের তিন ঘন্টা আগে 'গলগথা' নামক স্থানে যীশুকে ক্রুশে দেওয়া হয় (মার্ক-১৫ঃ২৫)। সন্ধ্যার পূর্বেই তাঁকে ক্রুশ থেকে নামানো হয়-কারণ পরদিন শনিবার ছিল 'সাবাত' অর্থাৎ ইহুদীদের পবিত্র দিন (যোহন-১৯ঃ৩১, লুক-২৪ঃ১)। যীশুকে ক্রুশ থেকে নামানোর পর হাত-পা ভাঙ্গা হয় নাই। একজন সিপাহী তাঁর কুক্ষিদেশে আঘাত করলে সেখান থেকে রক্ত ও পানি নির্গত হয় (যোহন-১৯ঃ৩৪)।

প্রশ্ন হলোঃ এই সব ঘটনা দ্বারা কী প্রমাণিত হয়? এই সব ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যীশু ক্রুশে মারা যান নাই (অজ্ঞান হয়েছিলেন) এবং আকাশেও উত্থিত হন নাই।

(৭) ক্রুশীয় ঘটনার পর যীশুর চিকিৎসা-ব্যবস্থাঃ

"যোসেফ" নামক আরিমিথিয়ার একজন ধনাঢ্য লোক, যিনি যীশুর শিষ্য ছিলেন- তিনি পীলাতের কাছে যীশুর দেহ যাচ্না করলেন" (মথি-২৭ঃ৫৭-৫৮)। যীশুকে কবরে দেওয়ার পর তাঁর শিষ্য যোসেফ এবং নীকদীম তাঁর ক্ষতস্থানগুলোতে ঔষধ লাগালেন এবং মসীনার কাপড় দ্বারা বেঁধে দিলেন (যোহন-১৯ঃ৩৯, মার্ক- ৬ঃ১৩)। ক্রুশের ঘটনার পর যীশু সুস্থ হয়ে গালীল নামক স্থানে শিষ্যদের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর মাতা মরিয়মকে সংগে নিয়ে প্রাচ্যের উদ্দেশ্যে হিজরত করেন। শুভ্র-বস্ত্র পরিহিত দুই পুরুষ (হাওয়ারী) বললেনঃ মৃতদের মধ্যে জীবিতদেরকে অন্বেষণ কেন করছো? (লুক-২৪ঃ২-৫)।

প্রশ্ন হলোঃ এই সকল ঘটনা অস্বীকার করার সমর্থনে কোন সাক্ষ্য আছে কি? সুতরাং যীশু ক্রুশে মারা যান নাই, বরং তিনি সুস্থ হয়ে গোপনে দেশত্যাগ করেন।

(৮) ছদ্মবেশে শিষ্যদের সংগে সাক্ষাৎঃ

এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত প্রমাণগুলো লক্ষ্যণীয়ঃ

হাওয়ারীগণ বললেন- দেখ, যীশু তোমাদের অগ্রে গালীলি যাচ্ছেন। সেখানে তাঁকে দেখতে পারবে।" (মথি-২৮ঃ৭-১০)।

তিনি মালীর ছদ্মবেশে গালীলীতে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে মিলিত হন। (যোহন-২০ঃ১৫)।

গালীলীতে যীশু তাঁর শিষ্যদের সন্দেহ নিরসনের উদ্দেশ্যে বললেনঃ "আমার হাত এবং আমার পা দেখ। কারণ আমায় যেমন দেখছো, আত্মার এরূপ অস্থি-মাংস নাই। এই কথা বলে তিনি তাদেরকে হাত ও পা দেখালেন।" (লুক-২৪ঃ৪৩, যোহন ২০ঃ২৭, প্রেরিত ১ঃ৩-৪ দ্রষ্টব্য।)

অতঃপর যীশু জৈতুন নামক পর্বতে আরোহণ করলেন, তখন একখানি মেঘ তাদের (শিষ্যদের) গতিপথ হতে তাঁকে গ্রহণ করলো। (প্রেরিত-১ঃ৯)

প্রশ্ন হলোঃ এই ঘটনাগুলোর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কি? বাইবেলের এই সকল বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ক্রুশের ঘটনার পর যীশু সুস্থ হয়ে চুপিসারে হিজরত করেন।

(৯) ইস্রায়েল জাতির হারানো মেষের সন্ধানে যীশুঃ

ক্রুশের ঘটনার পূর্বে যীশু বলেছিলেনঃ

"ইস্রায়েল জাতির হারানো মেষ ছাড়া আর কারও কাছে আমি প্রেরিত হই নাই।" (মথি-১৫ঃ২৪-২৬ ও মথি ১০ঃ৬ দ্রষ্টব্য)।

তিনি বলেনঃ "আমার আরও মেষ আছে, সে সকল এ খোঁয়াড়ের নয়। তাদেরকে আমার আনতে হবে এবং তারা আমার ডাক শুনবে-তাতে এক পাল এবং এক পালক হবে।" (যোহন-১০ঃ১৬)।

"অন্যান্য নগরেও আমাকে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে হবে, কেননা সেজন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।" (লুক-৪ঃ৪৩)।

প্রশ্ন হলোঃ ক্রুশীয় ঘটনার পর যীশু হিজরত না করে যদি আকাশে গিয়ে থাকেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীগুলো কিভাবে পূর্ণ হয়েছে?

ঐতিহাসিক ভাবে একথা স্বীকৃত যে, জেরুযালেমে বসবাসরত ইস্রাইল জাতির ১২টি গোত্র কালক্রমে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ব্যাবিলনের সম্রাট নেবুখদনিৎসর কর্তৃক তারা বন্দী অবস্থায় ব্যাবিলনে আগমন করে। পরবর্তীতে পারশ্য-সম্রাট সাইরাসের মাধ্যমে তারা জেরুজালেমে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পায়। কিন্তু অল্পসংখ্যক ইহুদী জেরুজালেমে ফেরত যায়। পারশ্য-সম্রাট সাইরাস ব্যাবিলন দখলের পর তাঁর রাজ্য-সীমা দুর-দূরান্তে বিস্তৃতি লাভ করে। ফলতঃ ব্যাবিলনে বসবাসকারী ইহুদী গোত্রের অবশিষ্ট লোকেরা পারস্য, আফগানিস্তান, ভারত, কাশ্মীর, তিব্বত, প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। এই সকল অঞ্চলে যীশুর আগমন দ্বারা উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পূর্ণ হয়েছে।

(চলবে)

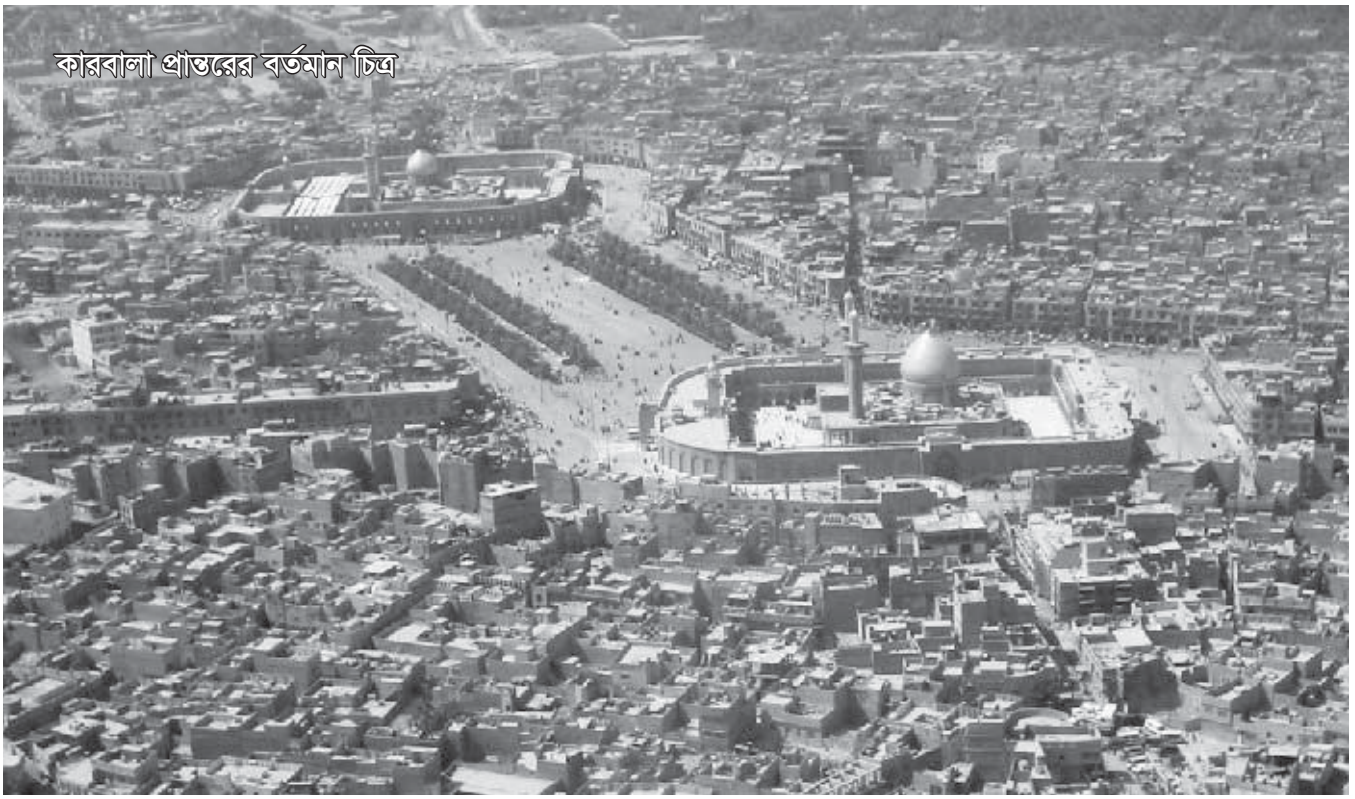

কারবালা প্রান্তরের বর্তমান চিত্র

‘ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না’

মাহমুদ আহমদ সুমন

পবিত্র মহররম মাস আমরা অতিবাহিত করছি। পবিত্র এ মাসের ১০ তারিখে মহানবী (সা.)-এর প্রিয় দৌহিত্র, চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতেমা (রা.)-এর পুত্র, হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে চক্রান্তকারী ইয়াজিদ বাহিনীর হাতে কারবালার প্রান্তরে নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন। প্রকৃত-ইসলাম ও সত্যের জন্য সেদিন হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) ইয়াজিদ বাহিনীর কাছে মাথানত না করে যুদ্ধ করে শাহাদতবরণ করেছিলেন। হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) সেদিন ন্যায় ও সত্যের জন্য চরম আত্মত্যাগের যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, তা অনুকরণীয়। শিয়ারা বর্তমানে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর শাহাদতের শোকে যে মাতম করে, তা আবেগ-তাড়িত এক বেদাত ছাড়া কিছুই নয়। আমাদের জাতীয়-কবি কাজী নজরুল ইসলাম হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর শাহাদতের দিনকে স্মরণ করে যথার্থই লিখেছেন, ‘ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না’।

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর ত্যাগের কথা আমাদেরকে স্মরণ করতে হবে। রাস্তা-ঘাট বন্ধ করে, অপরকে কষ্ট দিয়ে, শোক প্রকাশের কোন শিক্ষা ইসলামে নেই, আর শোক-দিবস পালনের কোন অনুমতিও শ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর উম্মতকে দেননি। তবে হযরত রসূল (সা.) মৃত-ব্যক্তির জন্য মাত্র তিন দিন শোক পালনের অনুমতি দিয়েছেন, আর মৃত-স্বামীর জন্য স্ত্রীর পক্ষে চার মাস ১০ দিন ইদ্দতকাল পালনের নির্দেশ রয়েছে। পক্ষান্তরে, শহীদে কারবালা হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) বলে গেছেন- ‘আমি শহীদ হলে তোমরা আমার জন্য উহ্! আহ্! করো না, আঁচল ছিঁড়ো না, বরং ধৈর্য ধারণ করে থাকবে’।

ইসলামে যদি শোক দিবস পালন করার কোন বিধান থাকতো, তাহলে শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওফাত দিবসই শোক পালনের প্রধান দিবস হতো। কেননা, তিনিই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, ইহজগত ও পরজগতের অকৃত্রিম বন্ধু এবং মু’মিনদের জন্য হুযূর (সা.)-এর ওফাত অপেক্ষা শোকের আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু আমরা হুজুর (সা.)-এর ওফাত দিবসকে শোক দিবস হিসেবে পালন করি না। কারণ ইসলামে তা জায়েয নয়। আর হুজুর (সা.)-এর পরবর্তী সময়ে খোলাফায়ে রাশেদিন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও মুজতাহিদ ইমামরা কেউ তা পালন করেননি। ইসলামে শোক দিবস পালন না করার দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে অনেক রয়েছে।

যেমন, বদরের যুদ্ধে ১৩ জন, ওহুদের যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবি শাহাদতবরণ করেন এবং হুজুর (সা.)-এর চাচা সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত আমীর হামজা (রা.) ওহুদের

ময়দানে নির্মমভাবে শহীদ হন। তাঁর নাক, কান কেটে বিকৃত করা হয়, বুক চিরে কলিজা পর্যন্ত চিবানো হয়। এতে মহানবী (সা.) খুবই মর্মাহত ও শোকাভিভূত হন। মর্মান্তিক এ ঘটনার পর তিনি প্রায় আট বছর দুনিয়ায় ছিলেন। এ দীর্ঘ আট বছরে হুযূর (সা.) হযরত হামজা (রা.)-এর জন্য কোন শোক দিবস পালন করেননি।

এছাড়াও খোলাফায়ে রাশেদিনের তিন খলিফা হযরত ওমর (রা.), হযরত ওসমান (রা.), হযরত আলী (রা.) শাহাদত বরণ করেছেন। তাঁদের শোকে তো কোন মাতম করার প্রমাণ ইসলামে পাওয়া যায় না। কারণ, ইসলামে এর কোন অস্তিত্ব নেই।

পক্ষান্তরে শিয়া-সম্প্রদায় হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর জন্য মাতম করে, অথচ তাঁর পিতা হযরত আলী (রা.) শহীদ হওয়া সত্ত্বেও কোন শোক প্রকাশ করে না। তবে নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) খিলাফতে রাশেদার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য নিজ দেহের শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত দান করে গেছেন। তাঁর এই ত্যাগ যুগ যুগ ধরে মুসলিম উম্মাহকে খিলাফতে রাশেদার অনুরূপ আল্লাহ্ মনোনীত খলিফা ও ঐশী ইমামত-এর ছত্র-ছায়ায় জীবন অতিবাহিত করার অনুপ্রেরণা জোগাবে।

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর শাহাদতের ঘটনার জন্য প্রত্যেক মুসলমানই সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করে থাকে আর শিয়ারা প্রত্যেক বছর মহররম মাসে নিজস্ব-রীতি অনুসারে সেই দুঃখ এবং বেদনায় যে হা-হুতাশ করে থাকে, শুধু তাই নয় বরং তারা খুবই বাড়া-বাড়ি করে।

কারবালায় হযরত ইমাম হোসাইন (রা.), তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গ এবং কয়েকজন সাথী-সঙ্গীকে বড় নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। সত্যিকার অর্থে এ ঘটনা হযরত ওসমান (রা.)-এর শাহাদতের ঘটনারই একটি ধারাবাহিকতা ছিল। তাক্ওয়া যখন লোপ পেতে থাকে, আর ব্যক্তিগত-স্বার্থ যখন সমষ্টিগত স্বার্থের উপর প্রাধান্য পায়, তখনই এমন হয়।

হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইন (রা.) সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, জান্নাতের যুবকদের সরদার তারা। তাদের উভয়ের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ! আমি তাদেরকে ভালোবাসি, তুমিও তাদেরকে ভালবাস।

অতএব, যারা রসূলুল্লাহর দোয়ার কল্যাণ এতটা লাভ করেছেন, আর একই সাথে যারা শাহাদতের পদমর্যাদাও লাভ করেন, এমন মানুষ অবশ্যই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অনুসারে জান্নাতে মহান জীবিকা লাভ করবেন এবং তাদের হত্যাকারী অবশ্যই খোদার গযব এবং ক্রোধের শিকার হবে। আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে এই মহররম মাসে দশ তারিখে নিষ্ঠুর পাষাণরা রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর এই প্রিয়কে শহীদ করে। যে শাহাদতের ঘটনা শুনে গা শিউরে উঠে। এই পাষাণরা এক মুহূর্তের জন্যও চিন্তা করল না যে, কাকে আমরা খড়গাঘাত করতে যাচ্ছি।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) সেই সমস্ত কুপ্রথা এবং সামাজিক রীতি-নীতিকে মেটাতে এসেছেন, যার কারণে মানবিক মুল্যবোধ পদদলিত হয়। তিনি (সা.) কাফেরদের প্রতিও মার্জনা ও ক্ষমার নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু খোদার এই প্রিয় রাসূলের বড়ই আদরের দৌহিত্র, যার জন্য তিনি আল্লাহর কাছে এই দোয়া করতেন যে, 'হে আল্লাহ! আমি একে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাস এবং এও বলেছেন যে, যে আমার এই দৌহিত্রকে ভালোবাসে, সে আমাকে ভালবাসবে, যে আমাকে ভালোবাসে সে আসলে আল্লাহ পাককে ভালোবাসে, আর আল্লাহকে ভালবাসার ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

যে শিক্ষা নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) পৃথিবীতে এসেছেন, তা কিভাবে পদদলিত হয়েছে, সেটা হযরত হোসাইন (রা.) এর শাহাদতের ঘটনার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। হযরত হোসাইন (রা.)-এর সৈন্য বাহিনীর ওপর যখন শত্রু নিয়ন্ত্রণ পায়, তখন তিনি ঘোড়াকে সমুদ্রমুখী করে অগ্রসর হওয়ার জন্য ইচ্ছা করেন। তারপরও তাকে বাধা দেওয়া হয় এবং তার প্রতি তীর ছুঁড়া হয় এবং সেই তীর হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর চীবুকের নীচে লাগে। বর্ণনাকারী বলেন, শাহাদতের পূর্বে আমি তাকে এই কথাই বলতে শুনেছি, আল্লাহ্‌র কসম, আমার পর খোদার এমন কোন বান্দাকে তোমরা হত্যা করবে না, যার হত্যার কারণে আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি আরো বেশি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন।

আমি আশা করি, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন আর আমাকে সম্মানিত করবেন। এরপর আমার হত্যার প্রতিশোধ এমন ভাবে নেবেন যে, যা তোমরা ভাবতেও পার না। আল্লাহর কসম, আমাকে যদি তোমরা হত্যা কর, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের মাঝে যুদ্ধ সৃষ্টি করবেন এবং তোমাদের রক্ত ঝরবে। যতক্ষণ পর্যন্ত বেদনাদায়ক শাস্তিকে আল্লাহ বহুগুণে বৃদ্ধি না করেন, তিনি বিরত হবেন না। তাকে শহীদ করার পর কুফাবাসীরা তার পবিত্র লাশের সাথে কি ব্যবহার করেছে, তা দেখুন। আমর বিন সাদ আহবান জানিয়ে ঘোষণা দেয়, কে কে হযরত ইমাম হোসেনের মৃত দেহের ওপর ঘোড়া দৌড়ানোর জন্য প্রস্তুত। এই কথা শুনে দশজন ঘোড়া সওয়ার বের হয়, যারা নিজেদের ঘোড়া নিয়ে তাঁর পবিত্র দেহের ওপর ঘোড়া দৌড়ায় এবং পিষ্ট করে, আর তাঁর বক্ষ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়।

এই যুদ্ধে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর দেহে ৩৫টি তীর বিদ্ধ হয়। হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর মরদেহ পরবর্তীতে কুফার গভর্ণরের কাছে পাঠানো হয়। সে তাঁর শিরোচ্ছেদ করে এজিদের কাছে প্রেরণ করে। এই ছিল সেই নির্দয় ব্যবহার, যা তাঁর সাথে এবং তাঁর লাশের সাথে করা হয়েছে। এর তুলনায় অধিক নিষ্ঠুর ব্যবহার আর কি হতে পারে? তাঁর পবিত্র লাশের এমন অসম্মান, অবমাননা কোন নোংরা শত্রুও তার শত্রুর করতে পারে কি? কোন কলেমা পাঠক, যে সেই রাসূলের সাথে সম্পর্কের দাবী করে, যেই রাসূল মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁর মান্যকারীরা কখনো এমন কাজ করতে পারে না। এমন কাজের মাধ্যমে এমন লোকদের অভ্যন্তরে শুধু নোংরামী আর নোংরামীই প্রকাশ পায়। এরা দুনিয়ার কীট ছিল, এরা নিজেদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সাধুতা-ভদ্রতার সকল সীমা অতিক্রম করতে পারে এবং করেছে। ধর্মের সাথে

তাদের দুরতম সম্পর্ক নেই। এদের উদ্দেশ্যটা হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) উপলব্ধি করতে পেরেছেন, যার ফলে তিনি এজিদের বয়আত করতে অস্বীকার করেছিলেন।

তিনি এজিদের হাতে প্রতিনিধিদের একথাও বলেছিলেন যে, আমি যুদ্ধ চাই না, আমাকে যেতে দাও, আমি গিয়ে আল্লাহর ইবাদত করতে চাই বা কোন সীমান্তে আমাকে পাঠিয়ে দাও, যেন ইসলামের জন্য যুদ্ধ করতে করতে আমি শাহাদত বরণ করতে পারি বা আমাকে এজিদের কাছে নিয়ে যাও, যাতে আমি তাকে বুঝাতে পারি যে, আসল ব্যাপার কি। কিন্তু তার প্রতিনিধিরা কোন কথা শুনে নাই। অবশেষে যুদ্ধ যখন চাপানো হয়, তখন বীরপুরুষের মত মোকাবেলা করা ছাড়া তাঁর আর কোন উপায় ছিল না। এই স্বল্পসংখ্যক মুসলমান, যাদের সংখ্যা ৭০-৭২ হবে, তাদের মোকাবেলায় ছিল এক বিশাল সৈন্যবাহিনী।

এদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করা কোন ভাবেই সম্ভব ছিল না। একে একে তারা সবাই শাহাদত বরণ করেন। প্রতিশোধ নেয়ার আল্লাহ্ তা'লার নিজস্ব রীতি আছে, যেভাবে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) নিজেই বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার হত্যার প্রতিশোধ নিবেন, আর আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশোধ নিয়েছেনও। এজিদ বাহ্যত: সাময়িক সফলতা লাভ করেছে। প্রশ্ন হলো, এজিদের নেকীর কারণে কী আজকে কেউ তাকে স্মরণ করে? যদি তার সুখ্যাতি থাকতো, তাহলে মুসলমান নিজেদের নাম এজিদই রাখত। কিন্তু কোন ব্যক্তি নিজের বাচ্চার নাম আজ আর এজিদ রাখে না।

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর জীবনের একটি উদ্দেশ্য ছিল। তিনি কখনো রাষ্ট্র-ক্ষমতা অর্জনের লোভ রাখতেন না। তিনি সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। যে ন্যায়ের জন্য ইমাম হোসাইন দন্ডায়মান হয়েছিলেন অর্থাৎ খিলাফতের নির্বাচনের অধিকার রাষ্ট্রবাসীদের ও জামা'তের। কোন পিতা উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে তার ছেলেকে এই অধিকার দিতে পারে না। তিনি বলেন, এই নীতি আজও সেভাবেই পবিত্র, যেভাবে পূর্বে পবিত্র ছিল। হযরত ইমাম হোসেনের শাহাদত এই অধিকারকে আরো স্পষ্ট করেছে।

অতএব, সাফল্য লাভ করেছে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.), এজিদ নয়। আর আল্লাহ্ তা'লা আরো এক ভাবে প্রতিশোধ নিয়েছেন, আর তা কত ভয়াবহ দেখুন। এজিদের ইন্তেকালের পর তার ছেলে যখন সিংহাসনে আসীন হন, তার নাম তার দাদার নাম অনুসারে মুয়াবিয়াই ছিল। সে বয়াত নিয়ে সোজা ঘরে চলে যান। ৪০ দিন সে ঘর থেকে বের হননি। ৪০ দিন পর একদিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে মানুষের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন যে, আমার হাতে তোমরা বয়াত করছ, কিন্তু এজন্য নয় যে, আমি বয়াত নেয়ার যোগ্য মনে করি। বরং বয়াত নিচ্ছি এজন্য, যেন তোমাদের ভিতর ভেদাভেদ আর বিশৃংখলা সৃষ্টি না হয়। তখন থেকে আজ পর্যন্ত ঘরে আমি এটিই ভাবতে থাকি যে, তোমাদের মাঝে যদি কোন ব্যক্তি বয়াত নেয়ার যোগ্য থাকে, তাহলে ইমারত তার হাতে সোপর্দ করে আমি দায়িত্ব মুক্ত হতে চাই। কিন্তু অনেক করে ভাবা সত্বেও এমন কোন ব্যক্তি আমি পাই নাই।

তাই, হে মানব সকল! মনোযোগ সহকারে আমার কথাগুলো শুন যে, আমি এর যোগ্য নই। আর আমি এ কথাও বলতে চাই যে, আমার পিতা এবং আমার দাদাও এ পদের যোগ্য ছিল না। আমার পিতা হোসেনের তুলনায় বড় নিম্নমানের, নীচ মানুষ ছিল। আর তার পিতা হাসান হোসেনের পিতার তুলনায় নিম্ন মানের মানুষ ছিল। হযরত আলী (রা.) খিলাফতের যোগ্য ছিলেন আর এরপর আমার পিতা ও দাদার তুলনায় হাসান হোসাইন খিলাফতের বেশি যোগ্য ছিল। তাই ইমারত থেকে আমি অব্যাহতি নিচ্ছি।

দেখুন, কিভাবে ছেলে এইসব কথা বলে পিতা এবং দাদার মুখে চপেটাঘাত করেছে। এটি এই জন্যই যে তার হৃদয়ে খোদা-ভীতি ছিল। বস্তুবাদী মানুষের ঘরেও কিছু নেক সন্তান, সত্যের পূজারী সন্তান-সন্ততি হয়ে থাকে। তারপর তিনি বলেন যে, এটি তোমাদের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি, যার হাতে চাও, তোমরা বয়াত নিতে পার। এরপর এজিদের ছেলে ঘরে চলে যায়, ঘর থেকে আর বের হয়নি। আর কয়েক দিনের মাথায় তার ইন্তেকাল হয়। তো এটি এ কথার কত বড় প্রমাণ যে, এজিদের খিলাফত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঐকমত্য তো দূরের কথা, নিজের ছেলেও একমত ছিল না। কোন লোভের কারণে ছেলে এমনটি করেনি বা কোন বিরোধিতার ভয়ে তার ছেলে এমন করেনি, বরং সে নিষ্ঠার সাথে চিন্তা-ভাবনার পর এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, আলীর অধিকার বেশি ছিল আমার দাদার তুলনায়, আর হাসান হোসেনের অধিকার বেশি ছিল তার পিতার তুলনায়। আর আমি এ বোঝা নিজ কাঁধে বহনের জন্য প্রস্তুত নই।

অতএব, মুয়াবিয়ার এজিদকে নিযুক্ত করা এটি নির্বাচন আখ্যায়িত হতে পারে না। কোন ব্যক্তির তুলনায় এর চেয়ে বড় লাঞ্ছনা আর কি হতে পারে যে, সন্তান স্বয়ং পিতার স্বরূপ মানুষের সামনে উপস্থাপন করে পিতাকে হীন প্রমাণ করেছে।

অতএব, ইমাম হোসেনের ত্যাগ, কুরবানী আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা রেখে গেছে। নিজের অধিকার, নিজের জীবন, বাজি রেখে পৃথিবীতে সত্যের প্রসার করেছেন, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) সত্য প্রচারের যে আদর্শ রেখে গেছেন, তা আমাদের সব সময় আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে। হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর কারবালা প্রান্তরে শাহাদতবরণ ইসলামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। সত্য, ন্যায় এবং নবুয়তের পদ্ধতিতে আল্লাহ্‌র জমিনে সত্যিকারের ইসলামী- খিলাফত পুনঃপ্রবর্তনের লক্ষ্যে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা যে ত্যাগ ও কুরবানি স্বীকার করেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত তা আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। সত্যের পথে এবং অসত্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের তা জোগাবে হিম্মত ও প্রেরণা। শুধু একটি দিন তাঁকে স্মরণ করার মাধ্যমে কোন লাভ নেই। বরং তাঁর আদর্শ অনুসরণ করার বিষয়।

masumon83@yahoo.com

তবলীগ ও তার পদ্ধতি

খন্দকার আজমল হক

(২য় কিস্তি)

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রি (রা.) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন "তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পন্থাগুলো, (এমন কঠোরভাবে) অনুসরণ করবে যে, এক এক বিঘত ও এক এক গজ পরিমাণও (ব্যবধান হবে না)। এমনকি তারা যদি গুই সাপের গর্তের ঢুকে থাকে, তবে তোমরাও তাতে ঢুকবে"। হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা.) বলেন "আমরা আরজ করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! তারা কি ইহুদী ও নাসারাদের মত হবে?" তিনি বললেন, "তবে আর কাদের মত হবে"। (বুখারী, কিতাবুল ইতিসাম)

কুরআনপাকে ইহুদী ও নাসারা বা খ্রীস্টানদেরকে অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট বলা হয়েছে। এদের পথে যেন না চলি, এ জন্য আল্লাহপাক আমাদেরকে দোয়া শিখিয়েছেন। (১ঃ৬-৭) এবং এই দোয়া প্রতি নামাযে পড়া বাধ্যতামূলক করেছেন। হযরত মূসা (আ.) এর পর চর্তুদশ শতাব্দিতে অভিশপ্ত ইহুদীদের জন্য যেমন হযরত ঈসা (আ.) এর আবির্ভাব হয়েছিল, তদ্রুপ হযরত মূসা (আ.) সদৃশ্য হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর পর চর্তুদশ শতাব্দিতে ইহুদীরূপ মুসলমানদের নিকট হযরত ইমাম মাহদীর আগমন হবে, এজন্য তাঁকে হযরত ঈসা (আ.) নাম দেয়া হয়েছে।

এ ছাড়াও হযরত ঈসা (আ.) এর সাথে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর আরও মিল আছে। হযরত ঈসা (আ.) যেমন শান্তিপূর্ণভাবে আল্লাহর বাণী প্রচার করেছিলেন, তদ্রুপ হযরত ইমাম মাহদী (আ.)ও শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামের বাণী প্রচার করে গেছেন।

ইসলামের শিক্ষা প্রচারের জন্য যেমন তিনি মুসলিম আলেমদের সাথে মোবাহেলা মোবাহেসা করেছেন, তেমনই খ্রীষ্টান পাদ্রী ও আর্য সমাজী পন্ডিতদের সাথেও মোবাহেলা মোবাহেসা করেছেন। তিনি রসূলুল্লাহর সুন্নত অনুযায়ী বৃটেনের রাণী ভিক্টোরিয়া, পাদ্রী আলেকজান্ডার ডুই এর নিকটও পত্র দ্বারা ইসলামের দাওয়াত দেন। তিনি শিখদের কাছেও ইসলামের দাওয়াত দেন এবং প্রমাণ করেন যে, গুরু নানক মুসলমান ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর পর রসূলে করীম (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী 'খিলাফত আলা মিনহাযে নবুয়ত'-বা নবুয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁর আরধ্য কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে। মুসলমানদের আজ বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্বের মুসলমানদেরকে একতাবদ্ধ করে তাঁর খলীফাগণ বিশ্বের সকল ধর্মের মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইমাম মাহদী (আ.) ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি বিশ্বের সব ধর্মের প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ। বিষয়টি পরিস্কার হওয়া দরকার।

প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থে শেষ জামানায় বা কলি যুগে একজন ধর্ম সংস্কারকের আগমনের কথা বলা হয়েছে। মুসলমানগণ তাঁকে ইমাম মাহদী, হিন্দুগণ কল্‌কি অবতার, খ্রীষ্টানগণ ঈসা ইবনে মরিয়ম এবং বৌদ্ধগণ মৈত্রেয় বলে থাকে। বস্তুত একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পর ইসলামই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম, সেজন্য ইসলাম ব্যতীত অন্য সব ধর্মে কোন প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমনের পথ রুদ্ধ। তাই ইসলাম ধর্মে যিনি প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হিসেবে আসবেন, তিনিই হবেন অন্য ধর্মেরও প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ। যেমন জাগতিক-জীবনে একই জিনিসের বিভিন্ন নাম হয়ে থাকে। তেমনি একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন নাম দেয়া হয়েছে। যেরূপ, মুসলমানগণ পানিকে পানি বলে, হিন্দুগণ বলে জল, আবার ইংরেজগণ বলে ওয়াটার, অনেকে বলে একওয়া, আরবীতে বলে আব, এরূপ বিভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন নাম দেয়া হয়, অথচ জিনিষ একই। অনুরূপভাবে, শেষ-জামানায় আগমণকারী প্রতিশ্রুত মহাপুরুষকে বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়ে থাকে। এজন্যই হযরত ইমাম মাহদী এসে ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি যেমন মুসলমানদের মাহদী বা ঈসা মসীহ্, খ্রীষ্টানদের ঈসা ইবনে মরিয়ম, হিন্দুদের কলকী অবতার, বৌদ্ধদের মৈত্রেয় এবং অন্য কোন ধর্মে যদি এমন কোন প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমনের কথা থেকে থাকে, তবে তিনিই সেই ব্যক্তি।

মুসলমানদের অন্যান্য গোত্র ইসলাম প্রচার হতে হাত গুটালেও হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ইসলাম ধর্ম প্রচার করে যাচ্ছে। মোবাল্লেগ, মোয়াল্লেমগণ ছাড়াও আহমদীগণের অনেকেই এ কাজে রত আছেন।

প্রত্যেক কাজের জন্য কিছু নিয়ম-পদ্ধতি থাকে। ইসলাম প্রচার বা তবলীগের জন্যও কিছু পদ্ধতি আছে। সঠিক পদ্ধতিতে তবলীগ না করলে অনেক সময় অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। এমনকি, কোন কোন সময় তবলীগ কারীর জীবনও শংকিত হয়ে থাকে।

কুরআন মজীদে আল্লাহপাক এরূপ কিছু পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ কেবল তবলীগের নির্দেশ প্রদান করেই ক্ষান্ত হন নি, তবলীগের পদ্ধতিও বলে দিয়েছেন। তবলীগকারীগণ এ সকল পদ্ধতি অনুসরণ করলে অবশ্যই ভাল ফল পাবেন। পদ্ধতিগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল।

১. আল্লাহ পবিত্র কুরআনের একস্থানে বলেছেন "উদ্‌উ ইলা সাবিলি রাব্বিকা বিল হিকমাতে ওয়াল মাওয়িযাতিল হাসানাতি ও

যাদিল হুম বিল্লাতি হিয়া আহসানো"। অর্থ "তুমি হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান কর এবং তাদের সাথে এমনভাবে বির্তক কর, যা সর্বাধিক উত্তম। (১৬ঃ১২৬) এখানে হিকমত ও সদুপোদেশ প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহর পথে আহ্বান করার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। হিকমত বা প্রজ্ঞা এমন পন্থা, যা প্রয়োগে মানুষের ভেতর কোন বিরক্তি-ভাব সৃষ্টি হয় না। বাস্তব প্রসঙ্গ টেনে এনে তবলীগ করতে হবে, যাতে মানুষ আকর্ষিত হয়। কারো মনে আঘাত লাগে এরূপ কথা বলা যাবে না। এজন্য বলা হয়েছে "এমন ভাবে বির্তক কর যা সর্বোত্তম"। কোরআনের অন্য একস্থানে প্রচারকালে নম্রভাবে কথা বলার নির্দেশ রয়েছে। (২০ঃ৪৫)

২. কাউকে কোন কিছু বোঝাতে হলে বিনা প্রমাণে সে বুঝতে চাইবে না। এজন্য কোরআনের কোন কোন স্থানে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের কথা বলা হয়েছে। দলিল-প্রমাণ সম্পর্কে এক স্থানে বলা হয়েছে "যেন সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয়, যে দলিল প্রমাণ দ্বারা ধ্বংস হয়েছে এবং সেই ব্যক্তি জীবিত হয়, যে দলিল-প্রমাণ দ্বারা জীবন লাভ করেছে"। (৮ঃ৪৩) দলিল উপস্থাপন কালে যাকে তবলীগ করা হয়, তাকে তার ধর্ম-পুস্তক হতেই দলিল উপস্থাপন করতে হয়। একজন হিন্দু বা খ্রীষ্টানকে কোরআনের দলিল দিলে সে শুনবে না। তাদের ধর্মগ্রন্থ হতে দলিল দিলে তার বলার আর কিছু থাকবে না। যেহেতু আহমদী তবলীগকারীকে সকল ধর্মের লোকের নিকট-ই যেতে হবে তাই তাকে বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগ্রন্থের ওপর ভাল জ্ঞান রাখতে হবে। তবলীগ করার সময় অনেক প্রকার প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এ সকল প্রশ্নের জবাব দেবার সময় দলিল প্রমাণের সাথে যুক্তি-প্রমাণ ও উপস্থিত-বুদ্ধিরও প্রয়োজন হতে পারে। কুরআনের অনেক স্থানেই এ সকল যুক্তি প্রমাণের উল্লেখ আছে (দেখুন ৬ঃ৪৮)। প্রশ্নের জবাব প্রদানকালে সব সময় সজাগ থাকতে হবে, যেন অপ্রস্তুত না হতে হয়। তবলীগ করার ফলে তবলীগকারীর যেমন জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, তেমন তার উপস্থিত-বুদ্ধিরও প্রসার ঘটে। অনেক সময় নাস্তিককেও তবলীগ করতে হয়। নাস্তিক বলে তাদের নিকট হতে মুখ ফিরিয়ে নিলে চলবে না। তারা কোন ধর্ম-গ্রন্থের কথা শুনবে না। স্রষ্টা বা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আনয়নের জন্য বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করতে হবে। নাস্তিকদেরকে বোঝানোর জন্য কুরআনে অনেক যুক্তির কথা রয়েছে। হযরত ইমাম মাহদী (আ.) তাঁর ইসলামী নীতিদর্শন পুস্তকে কোরআনের কিছু যুক্তির উল্লেখ করেছেন। এগুলো ব্যবহার করা উচিত। পৌত্তলিকদেরকে বোঝানোর জন্য হযরত ইব্রাহীম (আ.) এরূপ যুক্তি- প্রমাণ উপস্থাপন করেছিলেন। (২৬ঃ৭০-৮০)

৩. তবলীগ করতে ধৈর্যের প্রয়োজন। আল্লাহ বলেছেন "বস্তুত ভাল ও মন্দ সমান নয়। অতএব, তুমি তা'দ্বারা (মন্দকে) প্রতিহত কর, যা সর্বোত্তম। ফলে ঐ ব্যক্তি, যার মধ্যে ও তোমার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে, সহসা তোমার বন্ধু হয়ে যাবে। কিন্তু সেটার অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই, যারা ধৈর্য্য ধারণ করে এবং তার অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই, যারা সৌভাগ্যশালী। (৪১ঃ৩৫-৩৬) তবলীগ করার সময় অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়, অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। অনেকে অনেক সহজ কথাও বুঝতে চায় না। ধৈর্য্য একটি মহৎ গুণ। কেউ বুঝতে না চাইলে অধৈর্য্য হলে চলবে না। ধৈর্য্যের সাথে তা মোকাবেলা করতে হবে। এ জন্য দোয়া করতে হবে, যেন কোন ভাবেই অধৈর্য্য না হতে হয়। কিন্তু এটা বড় কঠিন কাজ। তাই ধৈর্য্যশীলদেরকে সৌভাগ্যশালী বলা হয়েছে। কেননা, ধৈর্য্যধারণের মাধ্যমে তারা শত্রুকেও বন্ধু বানাতে পারে।

ছোটবেলার একটি কথা আমার মনে পড়ে গেল। ঐ সময় আমাদের বাড়িতে একবার গায়ের আহমদী মৌলভীদের সাথে আহমদী জামা'তের মুরব্বী সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেবের বাহাসের ব্যবস্থা করা হয়। মুরব্বী সাহেবকে সব সময় হাসিমুখে গায়ের আহমদী মৌলভীদের কথার জবাব দিতে দেখেছি। তিনি ছিলেন একা, আর তাদের বড় মৌলভীসহ অন্যান্যরা ছিল ৩/৪ জন। তিনি নিজের ওপর খুব আস্থাশীল ছিলেন। অধৈর্য্যের কোন ছাপ তাঁর চেহারায় দেখিনি। তবলীগকারীর ভেতর এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে।

৪. উত্তম আখলাক মানুষকে আকৃষ্ট করে। তাই তবলীগকারীকে উত্তম আখলাকের অধিকারী হতে হবে। আখলাকি তবলীগ একটি ভাল পদ্ধতি। কথায় বলে "আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও"। অন্যকে ভাল কথা বলতে গেলে নিজেকে ভাল হতে হবে। না হলে তার কথা অন্যের ওপর আসর করবে না। সেই ব্যক্তিই উত্তম-আখলাকের অধিকারী, যে সৎকর্মশীল। অর্থাৎ সৎকর্মশীল ব্যক্তিই উত্তম আখলাকের অধিকারী হয়ে থাকে। তাই তাঁর দিকে আহ্বানকারীর সাথে আল্লাহ আমলে সালেহার শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। বলা হয়েছে "ওয়া মান আহসানুল কাওলাম মিম্মান দাঈ ইলাল্লাহে ওয়া আমেলা সালেহান ওকালা ইন্নানি মিনাল মুসলেমিন"। অর্থ "এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে উত্তম, যে লোকদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে ও বলে নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্গত"। (৪১ঃ৩৪) এখানে এও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানকারী যে হবে, তাকে অবশ্যই আত্মসমর্পণকারী বা মুসলমান হতে হবে।

আমলে সালেহা বা সৎকর্ম না থাকলে ঈমান পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কোরআন বলে যে, শুধু ঈমান আনাই যথেষ্ট নয়, ঈমানদারদেরকে অবশ্যই সৎকর্ম বা আমলে সালেহা করতে হবে। এজন্য কোরআন পাকের যে সকল স্থানে ঈমানদারদেরকে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তার সাথে সৎকর্ম করার শর্ত যোগ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে কোরআন হতে অনেক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। এখানে দু'টি উদ্ধৃতি দেয়া গেল। একস্থানে বলা হয়েছে "যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, অবশ্যই আমরা তাদেরকে জান্নাতের বালাখানায় বসবাসের জন্য স্থান দান করব, যার তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত থাকবে। তথায় তারা সর্বদা অবস্থান করবে (২৯ঃ৫৯)। অন্য একস্থানে বলা হয়েছে "নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আপ্যায়ন স্বরূপ তাদের জন্য হবে জান্নাতুল ফেরদৌস। (উচ্চ স্তরের বেহেশত) তথায় তারা চিরকাল থাকবে এবং তা হতে তারা অপসারণ চাইবে না" (১৮ঃ১০৮-১০৯)।

(চলবে)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর হাতে বয়আত করা জরুরী

মৌ. এনামুল হক রনি

ভূমিকাঃ নবীমান্য করাও আল্লাহ্‌র ইবাদত

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাঁর ইবাদত করতে আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ পাকের বাণী বা প্রথম আদেশ হলো ঃ

অর্থ ঃ হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের সেই প্রভু-প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাক্‌ওয়া (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভয়-ভক্তি-ভালবাসা) অবলম্বন করতে পার। (সূরা বাকারা ঃ ২২)

এই আয়াত আমাদেরকে আদেশ করে যেন আমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করি। তাই ইবাদত শেখানোর জন্য আল্লাহ্ পাক যুগে যুগে নবী-রসূল প্রেরণ করে আসছেন। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে যুগের যখন প্রয়োজন হয়েছে, আল্লাহ্ পাক তাঁর পক্ষ থেকে কাউকে না কাউকে পাঠিয়েছেন। আর আমরা এভাবে একলক্ষ চব্বিশ হাজার নবীকে মান্য করে আসছি। আর এই সিলসিলায় আমাদের প্রিয়-নবী সর্বশ্রেষ্ঠ-নবী হলেন সৈয়্যদুল মুরসালীন, খাতামান নাবীয়ীন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তাই সকল নবীর এতায়াত করা, তাঁদের প্রতি বিশ্বাস করা, নবী করীম (সা.) আমাদেরকে শিখিয়েছেন। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ 'আমরা তাঁর রসূলদের কারো মাঝে পার্থক্য করি না।' (বাকারা ঃ ২৮৬)। এর সোজা অর্থ, সকল নবী আল্লাহ্‌র কাজ বা ইবাদত প্রতিষ্ঠা করতে আসে, এ বিষয়ে কোন পার্থক্য নেই। তাই সকলকে মান্য করা আমাদের ঈমানের অঙ্গ।

প্রিয় নবী (সা.)-এর শুভ সংবাদ

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমাদেরকে এমন কতিপয় শুভসংবাদ দান করেছেন, যা সত্যই আনন্দ ও আশার বাণী। একটি হাদীস নিম্নরূপ ঃ হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ অর্থ ঃ 'আমি তোমাদেরকে মাহ্‌দীর সুসংবাদ দিচ্ছি তিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন সময়ে আবির্ভূত হবেন, যখন মানুষের মধ্যে মত-বিরোধ দেখা দিবে এবং বহু ভূকিম্প হবে। (আন নাজমুস্ সাকিব ২য় খন্ড, ১১ পৃষ্ঠা)

ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর আগমনের শুভ সংবাদ হযরত রসীল করীম (সা.) চৌদ্দশত বছর পূর্বেই দিয়ে গেছেন। (আ.) অন্য হাদীসে তিনি উল্লেখ করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ অর্থ- 'তোমরা কত সৌভাগ্যশালী হবে, যখন তোমাদের মাঝে মরিয়মের পুত্র আগমন করবে এবং তিনি তোমাদের মাঝ থেকে তোমাদের ইমাম হবে।" (বুখারী শরীফ) প্রায় একই ধরনের বর্ণনা মুসলিম শরীফের একটি রেওয়ায়েতেও এসেছে। হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ রসূল করীম (সা.) এর 'এ সকল হাদিস থেকে ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর আগমন শুভ সংবাদ জানতে পারি।' (মুসলিম শরীফ কিতাবুল ঈমান)

পবিত্র কুরআনে ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর আগমনের সংবাদ

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ আমাদের জন্য হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর সংবাদ দিয়েছেন। যেমন– অর্থ- 'আর তাদেরই মাঝ থেকে অন্যদের প্রতিও (তিনি তাকে আবির্ভূত করবেন) যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়। এ হলো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। তিনি যাকে চান তা দান করেন।

আর আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহের অধিকারী। (সূরা জুমা ঃ ৪-৫)।

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, মহানবী (সা.) আরব ব্যতীত অন্য আর একদল লোকের মধ্যে আবির্ভূত হবেন, যারা তাঁর সমসাময়িক অনুসারীদের অর্থাৎ তাঁর সাহাবীদের সাথে মিলিত হয়নি। 'আখারিনা' শব্দে অন্যদের কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে এই আয়াতে শেষ যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ্রূপে মহানবী (সা.) এর দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক আবির্ভাব ঘটবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে।

বুখারী শরীফে ইমাম মাহ্দীর কথা

মহানবী (সা.) স্বয়ং হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর আগমনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন। প্রসিদ্ধ সেই বর্ণনাটি হলো নিম্নরূপ ঃ অর্থ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমরা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসেছিলাম, তখন সূরা জুমা, যার মধ্যে 'ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়াহাকু বিহিম' আয়াত আছে, অবতীর্ণ হলো। বর্ণনাকারী বললেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল! তারা কারা (যারা এখনও আমাদের সাথে মিলিত হয়নি)? কিন্তু তিনি এর কোন উত্তর দিলেন না, এমন কি তিনবার জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন সালমান ফারসীও আমাদের মধ্যে ছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালমান ফারসি (রা.) এর ওপর হাত রেখে বললেন, ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রে চলে গেলেও তাদের (পারশ্য বংশোদ্ভুত) এক বা একাধিক ব্যক্তি সেখান থেকে তা নামিয়ে আনবে। (বুখারী কিতাবুত্-তফসীর, ২য় খণ্ড)

মহানবী (সা.) এর এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, আয়াতটিতে যে-ব্যক্তির আগমনের কথা বলা হয়েছে, তিনি পারশ্য বংশীয় হবেন।

হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর কাজ

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা দেখতে পাবে ঈসা ইবনে মরিয়মকে ন্যায় বিচারক ইমাম মাহ্দীরূপে। তিনি ক্রশ (মতবাদ) ধ্বংস করবেন এবং শুকর বধ করবেন ও ধর্ম- যুদ্ধ রহিত করবেন।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল) এগুলো হলো ইমাম মাহ্দী (আ.) এর ৪ টি প্রধান কাজ। অপর একটি হাদীসে বর্ণনা এসেছে ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে মোজাদ্দেদ বা সংস্কারক প্রেরণ করবেন, যিনি ধর্মকে সঞ্জীবিত করবেন। (আবুদাউদ ও মেশকাত) এই হাদীস অনুসারে প্রত্যেক শতাব্দীতে মোজাদ্দেদ আগমন হওয়া আবশ্যক। তা হলে প্রশ্ন হলো, এ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ কে? আর যেহেতু চৌদ্দ শতাব্দীর যিনি মোজাদ্দেদ, তিনিই মাহ্দী হবেন, এই শতাব্দীতে ইমাম মাহ্দী (আ.) এর আগমন জরুরী।

হিজরী চৌদ্দ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ ইমাম মাহ্দী (আ.)

বুযুর্গানে দ্বীন, আলেম, উলামা চৌদ্দ শতাব্দীর দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। আর হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হিজরী ১৩০৬ সনে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্র আদেশে মোজাদ্দেদ এবং পরে ইমাম মাহ্দী (আ.) হওয়ার দাবী করেন। তিনি (আ.) বলেন ঃ "আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পবিত্র ইলহামের মাধ্যমে আমাকে জ্ঞাত করেছেন যে, আল্লাহ্র পক্ষ হতে আমাকে এ শতাব্দীর মসীহ্ মাওউদ এবং মাহ্দী মাহুদ নিযুক্ত করেছেন। সুতরাং মুসলমানদের মধ্যে বিরাজিত অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক মত-পার্থক্য মীমাংসার জন্য এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে হাকাম হিসাবে মনোনীত করেছেন। রসূলে করীম (সা.) আমাকে 'মসীহ্' এবং 'মাহ্দী'– এই দুই উপাধিতে ভূষিত করেছেন। ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক এ দু'টি নামেই আমাকে সম্বোধন করা হয়েছে। (আরবাঈন পুস্তক, ৩য় পৃষ্ঠা) তিনি (আ.) আরো বলেন ঃ "খোদার ফজলে এবং তাঁরই বিশেষ অনুগ্রহে সেই যুগ-ইমাম তথা ইমামুজ্জামান আমিই। বস্তুত: এর সকল চিহ্ন এবং নিদর্শনাবলী আল্লাহ্ তা'লা আমার মধ্যে পুঞ্জীভূত করেছেন।" (জরুরতুল ইমাম)।

ইমাম মাহ্দী (আ.)-কে মান্য করার গুরুত্ব

হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, হযরত ইমাম মাহ্দী আস্লে তাঁকে মান্য করতে হবে। তিনি (সা.) বলেছেনঃ অর্থ "যে ব্যক্তি জামানার ইমামকে না মেনে মারা যাবে, সে জাহেলিয়াতে মৃত্যুবরণ করবে।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল) অপর একটি হাদীসে রসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ অর্থ যখন তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে, তাঁর হাতে বয়আত নিবে, যদি বরফের ওপর হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়। অবশ্যই তিনি আল্লাহ্র খলীফা আল-মাহ্দী। (সুনানে ইবনে মাজা বাবু খুরুজুল মাহ্দী)

ওপরে বর্ণিত হাদীসগুলি দ্বারা হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)কে মান্য করে তাঁর হাতে বয়আত নেওয়ার কথা অত্যন্ত জোড়ালো ভাবে জানানো হয়েছে। তাই আমাদের সকলের জন্য, বিশেষ করে উম্মতে মুসলেমার জন্য তাকে মান্য করা আবশ্যক।

হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) ২৩ মার্চ ১৮৮৯ বয়আত শুরু করেন

ইলহামের আলোকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশ পেয়ে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়ে বয়আতের গুরুত্ব প্রকাশ করেছেন। এরপর বয়আতের ১০ টি শর্ত, যা তৌহিদ, শিরক না করা, নামায প্রতিষ্ঠা, দরূদ পাঠ, খাতামান নাবীঈনে বিশ্বাস, মুসলমানদের বা কোন সৃষ্টির কষ্ট না দেয়া, ধর্মের কাজে প্রাধান্য দেয়া, ইমাম মাহ্দী (আ.) এর সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন, সুখে-দুঃখে খোদার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন সহ সকল প্রকার পাপও অহংকার পরিহারের শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এরপর ২৩ মার্চ ১৮৮৯ সনে ভারতের লুধিয়ানায় বয়আত গ্রহণ শুরু করেন। ঐ দিন চল্লিশ জন পুণ্যাত্মা বুজুর্গ আলেম বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। এভাবে আহমদীয়া জামা'ত বিশ্বের ২০৭ টি ছড়িয়ে গেছে এবং বয়আত গ্রহণ এখনো চালু আছে ।

হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)কে সাহায্য করুন

আল্লাহ্র খলীফা হচ্ছেন ইমাম মাহ্দী (আ.)। আল্লাহ্ তাঁকে সাহায্য করে আসছেন এবং সাহায্য করতেই থাকবেন। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ অর্থ- আল্লাহ্ লিখে রেখেছেন যে, আমরা এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হবে।" (মুজাদালা ঃ ২২) আল্লাহ্র প্রেরিত বান্দা বিজয়ী হবেন, কিন্তু আমরা সেই সৌভাগ্যবান হতে হলে কী করতে হবে? রসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ অর্থ প্রত্যেক মুসলমান মু'মিনের ওপর ওয়াজিব হবে সর্বোত্তম ভাবে ইমাম মাহ্দীর সাহায্য করা এবং তাঁর ডাকে সাড়া দেওয়া।" (সুনানে আবুদাউদ, কিতাবুল মাহ্দী)

একজন মু'মিন-মুসলমান হিসাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) নির্দেশ মান্য করে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর হাতে বয়আত করা উচিত। একই সাথে বয়আত করার পর ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ধন-সম্পদ, জীবন ও সময় দিয়ে সাহায্য করা উচিত। আমাদেরকে আল্লাহ্ বয়আত পুরা করার এবং এ জামা'তকে সকল ধরনের সাহায্য করার তৌফিক দিন, আমীন।

নবীনদের পাতা-

পৃথিবীতে একমাত্র আহমদীরাই সংঘবদ্ধ

মোহাম্মদ আতা এলাহী শুভ, রংপুর

কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর রাসূলা ওয়া উলিল আমরি মিনকুম।" অর্থাৎ তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর এই রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেওয়ার অধিকারী। (সূরা নিসা ঃ ৬০) এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা খেলাফতের ও নেতৃত্বের কথা বলেছেন এবং সেই নেতৃত্বের নির্দেশ মানার জন্য আদেশ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়,। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা আরো বলেছেন, "তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধর এবং তোমরা পরস্পর বিভক্ত হয়ো না। (সূরা আলে ইমরান ঃ১০৪)

নেতৃত্ব ছাড়া কোন দল চলতে পারে না। নেতৃত্ব না থাকলে সেই দল বা সংগঠনের মাঝে বিশৃংখলা দেখা দেয়। আর যে সংগঠনের নেতৃত্ব থাকে, সে দলের মাঝে শৃংখলা থাকে। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে নেতৃত্ব রয়েছে, যা অন্য কোন দল বা সংগঠনের মাঝে নেই। আর এজন্যই আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এত সুশৃংখল একটি জামা'ত। উপমহাদেশের একজন লিডার এবং ইসলামিক চিন্তাবিদ জনাব ইনফাক হুসেন সাহেব প্রণীত "খুনকে আঁসু" নামক পুস্তকে লিখেছেনঃ প্রকৃতপক্ষে আমরা মেষপালক সদৃশ। নিজেদেরকে আমরা সুসংগঠিত জামা'ত বলতে পারি না। কিন্তু আহমদী মুসলমানরা নিজেদের জামা'তকে সু-সংগঠিত বলতে পারেন। কেননা তাদের মাঝে আছে সংগঠন।"

হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যের হাত জামা'তের ওপর। আল্লাহ্ তাদেরকেই সাহায্য করেন, যারা সংঘবদ্ধ হয়ে নিজেরা জামা'ত বানিয়ে থাকে। পৃথিবীতে একমাত্র আহমদীরাই নেতৃত্বের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ এবং পঞ্চম খলীফার নির্দেশের মাধ্যমে এই জামা'ত পরিচালিত হচ্ছে।

কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন, যেভাবে তিনি পূর্ববর্তীদের মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আর এভাবে তিনি তাদের জন্যে তাদের দ্বীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন" (সূরা নূর ঃ ৫৬)।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, তোমাদের দ্বীনের আরম্ভ নবুওয়ত ও রহমতের মাধ্যমে এবং তা তোমাদের মাঝে ততক্ষণ থাকবে, যতক্ষণ আল্লাহ্ চান। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, যতক্ষণ আল্লাহ্ চান। অতঃপর আল্লাহ্ তা-ও উঠিয়ে নিবেন। এরপর শুরু হবে রাজতন্ত্রের যুগ এবং যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন তা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এরপর আল্লাহ্ তাও উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর শুরু হবে যুলুমতন্ত্র এবং তা-ও আল্লাহ্ যতদিন চাইবেন ততদিন থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তা-ও উঠিয়ে নিবেন। এরপর পুনরায় নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। নবীর সুন্নত অনুযায়ী তা কাজ করে যাবে। এরপর বর্ণনাকারী বলেন যে, নবী করীম (সা.) চুপ করে গেলেন। (মুসনাদ আহমদ, ৫ম খণ্ড, ৪৩৪ পৃষ্ঠা)।

উম্মতে মুহাম্মদীয়া যখন কুরআনের শিক্ষার ওপর আমল করবে, তখন আল্লাহ্‌র এই অঙ্গীকার পূর্ণ হবে। কুরআন ও হাদীসের উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ১৯০-৯১ খৃষ্টাব্দে ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মওউদ হবার দাবী করেন এবং ঐশী নিয়ন্ত্রণে ইসলামের বিশ্ববিজয়ের প্রক্রিয়া আরম্ভ করেন।

ঐশী নিদর্শনের মাধ্যমে তিনি তাঁর সত্যতার প্রমাণ করেন। ১৯০৮ সনের ২৬ মে তারিখ তিনি ইন্তেকাল করেন। এ সময় সারা বিশ্বে তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪ লাখ। খিলাফতের স্থায়িত্বকাল সম্পর্কে ইমাম মাহ্‌দী (আ.) বলেন, 'আমি যখন চলে যাব, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই 'দ্বিতীয় কুদরত' অর্থাৎ খলীফা প্রেরণ করবেন, যা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকবে। (আল-ওসীয়্যত : পৃষ্ঠা, ৭-৮)

১৯০৮ সনের ২৭ মে তারিখে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর প্রথম খলীফা নির্বাচিত হন হযরত হাফেয মৌলবী হেকিম নুরুদ্দীন (রা.)। খিলাফতের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন কারীদেরকে লক্ষ্য করে তিনি (রা.) বলেন, "এখন আপত্তি উত্থাপন করার তোমরা কে? আপত্তি যদি থাকে, তাহলে যাও, খোদার ওপর আপত্তি কর। কিন্তু এ অন্যায় ও বেয়াদবীর ফল সম্বন্ধেও অবহিত হও। ফিরিশ্‌তা হয়ে গিয়ে আনুগত্য কর ও বিনয় অবলম্বন কর, ইবলিশ হয়ো না। (বদর, ৪ঠা জুলাই, ১৯৯২ খৃষ্টাব্দ)

নেযামে খেলাফত কোন মানবীয় প্রচেষ্টা নয়, বরং আল্লাহ্‌র ওয়াদা অনুযায়ী আল্লাহ্‌র সরাসরি হস্তক্ষেপে প্রতিষ্ঠিত হয়। হাদীসে আছে,

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে নতুন সংযোজন করা হচ্ছে যে, এখন থেকে সকল আহমদী সদস্য যারাই লেখা পাঠাতে ইচ্ছুক তারা ন্যাশনাল সেক্রেটারী, ইশায়াত বরাবর লেখা পাঠাবেন। সেক্ষেত্রে নিম্ন ঠিকানায় লিখতে হবে।

বরাবর
ন্যাশনাল সেক্রেটারী, ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

"মহানবী (সা.) মৃত্যুর সময় হযরত আয়েশা (রা.)কে কাছে ডেকে বলেন, তোমার পিতা হবেন আমার পরে এই উম্মতের খলীফা। কিন্তু তোমরা এই কথা কাউকে বলো না। কারণ, খলীফা মহান আল্লাহ্ নিজে নির্বাচন করেন।"

আজ আহমদীয়া খেলাফতের ধারাবাহিকতায় ৫ম খলীফার খেলাফত কালেও সত্যের প্রচন্ড বিরোধিতা চলছে। অন্ধ আলেমদের মারমুখি বিরোধিতার কবল থেকে আল্লাহ্ তা'লা যেন এই জামা'তকে নিজের কোলে তুলে রেখেছেন। আর এর মাঝে এই জামা'ত উন্নতির পর উন্নতি করেই যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে খিলাফতের আশিস হতে কল্যাণমন্ডিত হবার তৌফিক দান করুন। আমীন, সুম্মা আমীন।

মহান আল্লাহ্‌র কাছে আমরা কৃতজ্ঞ

আকমাল হোসেন মনির, রংপুর

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, প্রবল বিরোধীতা সত্বেও যে জামা'ত আজ নাগাদ বিশ্বের ২০৭ টি দেশে বিস্তার লাভ করেছে এবং ক্রমশ বেড়ে চলেছে, যা কোন রূপ সন্দেহ ছাড়া প্রমাণ করে যে, হযরত মির্যা সাহেব সত্য-মাহ্‌দী।

পবিত্র কুরআন-এ সূরা আন'আমের ২২নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,–"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর নির্দেশনাবলী প্রত্যাখ্যান করে, তাঁর চেয়ে বড় যালেম আর কে? নিশ্চয় যালেমরা কখনো সফল হয় না।" অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার ওপর মিথ্যা আরোপ করে, এবং দাবি করে সেই ব্যক্তির জীবন তাঁর নিদর্শনকে মিথ্যা বলে, অবশ্যই বিফল হয়।

যারা ঐশী-বাণী প্রাপ্ত হয়ে নিজেকে প্রেরিত বলে ঘোষণা প্রমাণ হচ্ছে এই যে, করে তাদের সত্যতা যাচাই করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে স্পষ্ট নীতিমালা নির্ধারণ করেছেন। যে কোন দাবিদারকে আমরা কুরআনের আলোকে অতি সহজে যাচাই করতে পারি।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর সত্যতার প্রথম প্রমাণ তাঁর আগমনের সময়সীমা নির্ধারিত ছিল, তিনি ত্রয়োদশ হিজরী শতাব্দীর শেষ বা চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুতে প্রেরিত হবেন। যথা সময়েই অর্থাৎ ১৩০৬ হিজরী সনে হযরত ইমাম মাহ্‌দী হবার দাবি করেন। এ সময়ে বিভিন্ন ফেরকা এবং মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মত বিরোধ ও অশান্তিসহ ঘন ঘন ভূমিকম্প, প্লেগ, এইডস ও অন্যান্য মহামারি রোগের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দাবির পূর্বে তাঁর জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ ছিল তাঁর সততা, সত্যবাদিতা। মক্কাবাসীরা তাঁকে 'আল-আমীন' আখ্যা দিয়েছিল। যারা ইসলামের ঘোর শত্রু, তারাও কোনদিন হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে সত্যবাদী ব্যতীত অন্য কিছু বলতে পারেনি। তদ্রুপ, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর দাবীর পূর্বের জীবন ছিল নিষ্পাপ ও পবিত্র। আপন-পর কেউই আজ পর্যন্ত হযরত মির্যা সাহেবের জীবন চরিত্রে কটাক্ষ করতে পারে নি। ঐ যুগের বড় বড় দেশ বরেণ্য আলেম-উলামা, সমাজপতি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হযরত মির্যা সাহেবের প্রশংসায় বহু কথা লিখেছেন।

এছাড়া হযরত মির্যা সাহেব নিজেই বিরুদ্ধবাদীদের পতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেছেন– "কে আছে যে, আমার জীবনীতে কোন দোষ বের করতে পারে?" (তাযকেরাতুশ শাহাদাতাঈন)

পবিত্র কুরআনের সূরা আনফাল-এর আয়াত নং ৪৩ এ আল্লাহ্ বলেন– "তারাই ধ্বংস হয়, যারা সুস্পষ্ট যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে ধ্বংস হবার যোগ্য এবং তারাই টিকে থাকে, যারা সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে টিকে থাকার যোগ্য"। বিরুদ্ধবাদীরা, যারা তাদের মনগড়া দলিল-প্রমাণাদি ও শক্তি দিয়ে হযরত মির্যা সাহেবের বিরোধিতা করেছিল, আজ তাদের নাম নিশানাও বিদ্যমান নাই। অপর পক্ষে, হযরত মির্যা সাহেব কৃর্তক প্রতিষ্ঠিত জামা'ত বিশ্বের কোণায় কোণায় বিস্তার লাভ করছে। এখন এটি সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, হযরত মির্যা সাহেব সত্য-মাহদী। একাগ্রতা, 'তাক্‌ওয়া' বা 'আল্লাহ্‌র ভয়' যাদের মধ্যে আছে, তারা সত্য গ্রহণ করতে পারে। আর আমরা সেই সত্য গ্রহণ করে সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। এ কারণে আমরা সকলেই মহান আল্লাহ্ তা'লার কাছে কৃতজ্ঞ।

শুভ বিবাহের সংবাদ প্রকাশ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞপ্তি

সুধী আহমদী সদস্যবৃন্দ! আপনারা সকলেই অবগত আছেন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় দীর্ঘকাল ধরে আহমদী ছেলে-মেয়েদের শুভ বিবাহের সংবাদ প্রকাশিত হয়ে আসছে। আপনারাও এখানে অতি আগ্রহ নিয়ে সংবাদ প্রকাশের জন্য আমাদের কাছে আবেদনও জানাচ্ছেন। আপনাদের জন্য একটি সুসংবাদ হলো বিয়ের সংবাদের পাশে পাত্রের ছবিও এখন থেকে ছাপানো যাবে। এছাড়া এখন থেকে "আহমদী" পত্রিকায় বিয়ের সংবাদ ছাপানোর জন্য প্রত্যেক আহমদী সদস্যকে ৩০০/- (তিনশত) টাকা করে দেয়াও বাঞ্চনীয়। এতে করে আনন্দঘন পরিবেশে আমাদের দ্বারা ধর্মের সেবাও কিছুটা হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কুরবানীকে গ্রহণ করুন। (আমীন)

মাহবুব হোসেন
ন্যাশনাল সেক্রেটারী, ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল
"একজন আহমদী মুসলমান হিসাবে আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য।"
পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

একজন আহমদী মুসলমান হিসাবে আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য

পাঠক কলামের এবারের বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে চিন্তা করলে জামা'তে আহমদীয়ার বিবেকবান প্রত্যেকটি সদস্য সচেতন হয়ে যায়! পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ খাতামান নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে সম্বোধন করে বলেছেন–"নিশ্চয়ই তুমি অতি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত" (৬৮ঃ৫)। "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মাঝে উৎকৃষ্টতম আদর্শ" (৩৩ঃ২২)।

"ইহ্‌দিনাস্ সীরাতাল মুস্‌তাকীম"। সূরা আল ফাতেহার এই অংশের প্রজ্ঞা ও হিকমতপূর্ণ দোয়াটিতে এমন এক পূর্ণতত্ত্ব রয়েছে যা দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় উদ্দেশ্য সাধনের একমাত্র চাবিস্বরূপ। আল্লাহ্ পাক তাঁর সঙ্গে বান্দার মিলনের এবং তার (বান্দার) সংশোধনের স্বয়ং ইচ্ছা রাখেন। একজন আহমদী মুসলমান দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে তো অবশ্যই পড়েন, এ ছাড়া যুগ খলীফার তাহরিক অনুযায়ীও অসংখ্য বার এ দোয়াটি পড়ে থাকনে। আল্লাহ্‌র অমোঘ আদেশ পালনের সাথে যুগ-খলীফার ইতায়াতের মধ্য দিয়ে একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন অপরিসীম গুরুত্ব রাখে। কুরআনের পর সুন্নতই মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার প্রধান অনুগ্রহ। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীম অবতীর্ণের মাধ্যমে স্বীয় বাক্য দ্বারা তাঁর সৃষ্ট জীবকে আপন ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন, এটাতো ঐশী বিধানের কর্তব্য। যা পালন একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সুন্নত ঐ আদর্শ কার্য পদ্ধতির নাম যা পুণ্যবান মুসলমানের ওপর সাহস্র সহস্র মুসলমানকে চালিত করা হচ্ছে। মূলতঃ বিশ্বাসই মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করে এবং পুণ্যকর্ম সাধনের শক্তি প্রদান করে।

আহমদী মুসলমান হিসাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য দুই রকমের হয়। এক– 'প্রত্যক্ষ' এবং দুই– 'পরোক্ষ'। 'প্রত্যক্ষ' দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো সকল প্রকার সৎকর্ম নিষ্ঠার সাথে পালন করা। যেমন– কলেমা, নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ। মানুষের সঙ্গে সদাচরণ করা, নম্র ব্যবহার করা, সাধ্যমত দান-সদকাহ্ করা, কাউকে ধোঁকা না দেয়া, কোন অবস্থাতেই মিথ্যা না বলা, নিজে পরিচ্ছন্ন থাকা ও আশ-পাশের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখা, মানুষের মধ্যে কোন বৈষম্য না করা, ইসলাম পরিপন্থী সকল কর্ম থেকে নিজেকে সংযত রাখা, সকল প্রকার সৃষ্ট জীবের প্রতি সদয় ব্যবহার করা এবং সর্বোপরি নিয়মিত তবলীগ করা। আর 'পরোক্ষ' দায়িত্ব হলো–নিজের আত্মিক রূহানী-নফসের উন্নতি করা। একজন মুসলমানের কর্তব্যই হলো আল্লাহ্‌র দিকে মানুষকে আহ্বান জানানো যে তোমরা এক খোদার প্রতি ঈমান আনো।

আল্লাহ্ পাক মু'মিনগণকে আদেশ দিয়েছেন– "কুনা মাআস্ সাদেকীন"–অর্থাৎ তোমরা সত্যবাদীগণের সাহচর্য অবলম্বন করো।" "উজীবুত্ দাওয়াতাত্ দায়ে"- মূল্যবান বাণীটির ওপর আমল করে নিষ্ঠার সাথে নিজেদেরকে সর্বদা দোয়ায় রত রাখা উচিত। মলফুযাতে আছে, "দোয়ার ন্যায় অস্ত্রকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরতে হবে যা প্রভু ও দাঁসের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় করে।" 'নাফসের' মন্দ কাজের বিরুদ্ধে জেহাদ হলো উৎকৃষ্ট জেহাদ। নিজের মনকে কখনোই কু-প্রবৃত্তি বা মন্দকর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা যাবে না। হুযূর পাক (সা.) কুরআনের ওপর যেরূপ আমল করে স্বয়ং দেখিয়েছেন সেইরূপ আমলই একজন আহমদী মুসলমানের করা উচিত। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শকে নিষ্ঠার সাথে ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে প্রতিফলন ঘটানো দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মধ্যে পড়ে। সূরা আস্ সাফের ৩ ও ৪নং আয়াতে বর্ণিত আছে, "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা কেন তা বলো যা করো না? আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত ঘৃণিত যে তোমরা যা বলো তা করো না।"। হাদীসেও বর্ণিত আছে, "ইন্নামাল আমালু বিন্নীয়াত।" সতুরাং একজন খাঁটি আহমদীর মুখে যা বলে কাজেও তা-ই করে দেখানো উচিৎ! পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বকারী। স্রষ্টার সুন্দর প্রতিচ্ছায়া মানবের নিজ সত্ত্বায় প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্বিত করার উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র সিফ্‌তি গুণকে কাজের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করে প্রতিফলিত করার মাঝেই রয়েছে ইসলামের সার্থকতা। আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা সকল ধর্মীয় শিক্ষার নির্যাস। ইসলাম ধর্ম সেই বিষয়টির প্রতি এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, অন্য কোন ধর্মে এতটা নেই। হুযূর পাক (সা.) আল্লাহ্‌র মধ্যে এতই নিমগ্ন থাকতেন যে আরবের পৌত্তলিকরা বলে বেড়াতো যে মুহাম্মদ তার আল্লাহ্‌র প্রেমে পড়েছে! মূলত আল্লাহ্‌র হিতৈষী গুণাবলী যা মানুষের মনে প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে যা একজন প্রকৃত নিষ্ঠাবান মুসলমান নিজ চরিত্রে সন্নিবেশ করে থাকে। সত্য বিশ্বাসের সাথে সৎকর্মের সংযোগ থাকা একান্ত প্রয়োজন। ভালই হোক আর মন্দই হোক কোনো কাজই ফলহীন হয় না। কর্মানুযায়ী ফলাফল প্রাপ্য! হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) বলেছেন, "শুধু কথার কোনই মূল্য নেই তোমার ঈমানকে ভারী করো, অলঙ্কৃত করো।"

"কু-আনফুসেকুম ওয়া আহ্‌লেকুম নারাহ্"– অর্থাৎ তুমি নিজে দোযখের অগ্নি থেকে বাঁচো এবং পরিবার পরিজনকে বাঁচাও'। কুরআন করীমের এই অমোঘ বাণী একজন আহমদী মুসলমান অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে নিজের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নিয়েছে। জামানার শেষ

যুগে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)কে মানার মধ্য দিয়ে আহমদীরা নিজেরা তো জাহেলীয়তের মৃত্যু ও জাহান্নামের অগ্নি থেকে বাঁচার পথ পেয়েছে তেমনি তাদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্যও হবে অন্যকে তা জানিয়ে দেয়া। এজন্য তাকে মুত্তাকী ও নেক আমলকারী বান্দা হতে হবে! ইসলামের সত্যতা ও সঠিক রূপকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করাই হবে তার কাজ। ধর্মীয় জ্ঞান-সম্বন্ধীয় বিশ্বাসগত ভুল-ভ্রান্তি বহু মুসলমানদের মধ্যে প্রসার লাভ করেছে যার সংশোধন করা আহমদী মুসলমান হিসেবে অত্যন্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যের পর্যায়ে পড়ে। আসলে খেলাফতের প্রতি আন্তরিক ভালবাসাই পারে সকল পুণ্যকর্ম সমাধা করতে। যদি সংকল্প পবিত্র না হয় তাহলে সবচেয়ে সুন্দর পরিকল্পনাও বিপদের কারণ স্বচ্ছ মন মানসিকতা- প্রস্তুত না হয় তাহলে এতে মানুষকে খোদা থেকে দূরে ঠেলে দেবার আশংকা থাকে। আসলে মানুষ যেন ইহজীবনের তুচ্ছ ও সামান্য বস্তু অর্জনের জন্য তাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা নিয়োজিত না রাখে। পারলৌকিক জীবনের প্রস্তুতি ইহকালেই নেয়া দরকার– এমনতরো নিয়ত একজন নিষ্ঠাবান ও ধার্মিক আহমদীর আকাঙ্ক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয়!

ইসলামের শিক্ষা অসংখ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। কুরআনে সাতশত আদেশের বর্ণনা আছে বান্দার জন্য। এই আদেশগুলোর একটিও যদি কেউ অমান্য করার দোষে দোষী হয় তাহলে সে নিজেই নিজের মুক্তির পথ নিজে রুদ্ধ করে। আমরা যদি শত শত সততার সাথে আত্মবিশ্লেষণ করি তাতে দেখা যায় যে, আমরা যা শুনি তা সঙ্গে সঙ্গে আমরা সংশোধনের চেষ্টা করি। আবার অনেকের মধ্যে অল্পদিনের জন্য তা স্থায়ী হয় তারপর আবার তা ভুলে যায় এবং পুনরায় পূর্বের পথে ফিরে যায়! মালফুযাতে এর পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে–"ইস্তেগফার বহুল পরিমাণে পাঠ করো। কেননা ইস্তেগফার পাঠ সকল উন্নতির চাবিকাঠি। এটি এজন্য যে পাছে তার মন্দ কর্মের মাত্রা ছাড়িয়ে যায় এবং মানুষ মহিমান্বিত খোদার রোষানলে পতিত হন।" অতএব সকল আহমদীদের নিজ নিজ জীবনাচার সংশোধনের জন্য যথাযথ প্রচেষ্টা জারী রাখার তৌফিক দিন, আমীন।

আনোয়ারা বেগম, রংপুর

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই আমরা আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছি

আহমদী মুসলমান বলতে যারা আমরা প্রতিশ্রুত সংস্কার হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)কে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মামুর বলে গ্রহণ করে তাঁর হাতে বা তাঁর খলীফার হাতে বয়আত করেছি তাদের বুঝায়। বয়আতের সাথে বয়আতের দশটি শর্ত বিনা ব্যতিক্রমে পালন করার ও আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি। প্রত্যেক আহমদী খুব ভালভাবেই জানি আহমদীয়াত নতুন ধর্ম নয় প্রকৃত ইসলামই আহমদীয়াত যা সৈয়দনা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর নাযিল হয়েছিল। সময়ের ব্যবধানে আল্লাহ্‌র তকদীর এবং মুসলমানদের অবহেলা অসতর্কতা ও পার্থিবতার মগ্নতার ফলে প্রকৃত ইসলাম বিকৃতির শিকারে পরিণত হয়ে পড়েছিল স্বয়ং মুসলমান নামধারীরাই আজ তেহাত্তর ফের্কায় বিভক্ত শুধু তাই নয় নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটকাটিতে ও তারা আজ ব্যস্ত। বহুবিধ অনাচার ও বিদাতের মধ্যে তারা আজ আপাদ মস্তক নিমজ্জিত।

ইমাম মাহ্‌দী (আ.) বা তাঁর খলীফার হাতে বয়আত হয়ে আমরা প্রথমে প্রকৃত ইসলাম কি তা জানতে ও বুঝতে পেরেছি। বয়আত করার সাথে সাথেই আমাদের জীবনে এক আমুল পরিবর্তন এসেছে বটে তবে তা সুদৃঢ় করার চেষ্টা করি না ও বাস্তব জীবনে রূপ দেওয়ার কাজ চলমান প্রক্রিয়া। এতে সফলতা অর্জন করাই প্রত্যেক আহমদীর জীবনের কাম্য। আমরা কেউ যদি মনে করি আহমদীয়াত গ্রহণ করে আরমা অনুগ্রহ করেছি তা হলে ভুল করবো। একমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই আমরা আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছি। এমন কোন নিশ্চয়তা নেই যে আমাদের পতন হবে না। আর এমনি এমনিই আমরা জান্নাতে পৌঁছে যাব। আহমদী মুসলমান হিসাবে সর্বপ্রথম ব্যক্তি পর্যায়ে যে দায়িত্ব বর্তায় তা হল ইবাদতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। ব্যক্তি পর্যায়ে নামায কায়েম করা, সর্বত্র কুরআন পাঠ করা, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার যে বাধ্যতামূলক নেজাম কায়েম হয়েছে তাতে নিয়মিত বীনা ব্যতিক্রমে চাঁদা প্রদান করা। নিজেদের তরবিয়ত নিজেদের সন্তানদের তরবিয়ত এবং জামা'তি এব তবলীগের উদ্দেশ্যে আত্মীয় স্বজনকে সম্পৃক্ত করে হযরত আমীরুল মু'মেনীন মসীহ্‌র প্রত্যেকটি খুতবা এমটিএ-তে দেখা ও শুনা এবং কোন কারণে সম্ভব না হলে পত্রিকাতে পড়ে নেওয়া। নেজামের আনুগত্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকা এবং প্রত্যেকটি আদেশ যথা সময়ে বাস্তবায়ন করা একজন আহমদীর অবশ্য কর্তব্য। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে, পাড়াপ্রতিবেশীর সাথে সু সম্পর্ক, লেন দেন আচার আচরণ ব্যবসা বাণিজ্য সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রসূল এবং রসূল (সা.) এর প্রকৃত শিক্ষা পুনঃ প্রতিষ্ঠাকারী যুগ মামুর ও তাঁর খলিফার আনুগত্যে ও অনুকরণে সম্পাদন করা এবং বাস্তবে সফলতা অর্জন করাই একজন আদর্শ আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য।

আদর্শিক কথাতে আমরা যতই পরিপাটি হইনা কেন, ব্যক্তি চরিত্র যদি আমাদের উন্নত না হয় তবে সাধারণ মুসলমান ও আমাদের মধ্যে কোন তফাতই থাকবে না। তবলিগ করবো এবং তবলিগ করা আমাদের অন্যতম দায়িত্বও বটে। তবে নিজেদের জীবন আহমদীয়াত তথা ইসলামের রঙ্গে রাঙ্গিয়ে কথা ও কাজে সমন্বয় সাধন করে ইসলাম তথা আহমদীয়াতের অনন্য সাধারণ মহিমাময় রূপ তুলে ধরবো–এটাই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত। একদিনে হয়তো আমরা সব কাজে সফল হব না, তবে দৃঢ়তা থাকলে ইনশাআল্লাহ্‌ অবশ্যই আমরা বিজয়ী হব। আমাদের দোয়া হবে "হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা এক আমলকারীকে ইমামের দিকে আহ্বান জানাতে শুনেছি, তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন।" তাই আমরা ঈমান এনেছি অতএব হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর আমাদের দোষত্রুটি আমাদের কাছ থেকে দূর করে দাও এবং পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করে আমাদের মৃত্যু দাও। (আলে ইমরান ঃ ১৯৪) হে আমাদের প্রভু প্রতি-পালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেওয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং নিজ পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি কৃপা কর। নিশ্চয় তুমি মহান দাতা। (আলে ইমরান ঃ ৯)

সমগ্র বিশ্ববাসীকে নিজেদের আদর্শে ইসলামের রঙ্গে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পতাকাতলে সমবেত করা আহমদীয়াতের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, বড়চর

বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই আহমদীদের দায়িত্ব

আমরা আহমদীয়াতের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে ইসলামের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করি এবং পরিপূর্ণ ইসলামের শিক্ষার ওপরে আমল করার চেষ্টা করি। আহমদীয়াতে পদার্পণের সাথে সাথেই আমাদের অন্যদের থেকে আলাদা এবং গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য তৈরী করতে হবে। এ বিষয়ে মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর 'আহমদী ও গয়ের আহমদীতে পার্থক্য পুস্তকে লিখেন যেন তারা বুঝতে পারে আমরা তাদের থেকে ভিন্ন। যেমন ঃ আমাদের সম্পূর্ণ ভাবেই রসূলে করীম (সা.)-এর সুন্নতের ওপর আমল করতে হবে। শুধু বাহ্যিক ভাবেই নয়, আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক আধ্যাত্মিক ভাবেও উন্নতির চেষ্টা করতে হবে। এবং আমাদের সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে যার কথা আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমের সূরা আলে ইমরানের ১০৫নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন। "তোমাদের মাঝে এমন জামা'ত থাকা দরকার যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দিবে এবং অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করবে। এবং এরাই সফলতা লাভ করবে।" অতএব আহমদী হবার সাথে সাথেই আমাদের সেই সকল কাজ অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত যা শরিয়ত পন্থি। যার জন্য আমাদের আহমদী হিসেবে ঘৃণা করবে। সেই ধরনের কাজ করলে আমরা বাহ্যিক ভাবে আহমদী থাকলেও আল্লাহ্‌ই জানেন যে, তাঁর কাছে গ্রহণীয়তা কত টুকু পাব।

হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর মতে সকল আহমদীদের মধ্যে নামাযের অভ্যাস, নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত, সত্য বলার অভ্যাস, নম্রভাষণ, পবিত্র কথন, ধৈর্য ও সহনশীলতা, গরীবের প্রতি সহানুভূতি ইত্যাদি গুণাবলী থাকা জরুরী। (১৯৮৯ সালের জুমুআর খুতবা) বর্তমানে বিশ্বে আহমদীয়াত হচ্ছে শান্তির প্রতীক। তাই আমাদের সেই মান অক্ষুন্ন রাখা আমাদের কর্তব্য। যেন আমাদের কোন কারণে তার কোন গরমিল না হয়। শান্তি প্রতিষ্ঠা করাও আমাদের দায়িত্ব। কারণ এর মাঝেই লুকায়িত রয়েছে ইসলামের শিক্ষা তথা আহমদীয়াত। যেহেতু আমাদের জামা'ত একটি পৃথক জামা'ত তাই আমাদের এই উত্তম পৃথকীকরণ গুলোকে অন্যদের সামনে সুন্দর ভাবে তুলে ধরাও আমাদের কর্তব্য। যেন তারা বুঝতে পারে এই পৃথিকী করণ কোন অ-ইসলামিক নয়, বরং ইসলামের পরিপূর্ণ আনুগত্য আমাদের মওলা হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে নিয়েও অন্যদের মাঝে যে অদ্ভুত বর্ণনা পাওয়া যায় তার প্রকৃত রূপ তুলে ধরাও আমাদের দায়িত্ব। কারণ মুজাদ্দেদ আসার কারণই হলো, ধর্মকে সঞ্জীবিত করা, যাদের দ্বারা ভুল ভ্রান্তি, কু-প্রথা, অলসতা আছে তাদের মাঝ থেকে তা দূর করা। অন্যদের মত আমাদের গোলা-বরুদের শক্তি নেই, তাহলো 'দোয়া'।

আর এই দোয়ার মাধ্যমেই, আমাদের তদবীরের মাধ্যমেই আমরা আমাদের চরিত্রকে সুন্দর ভাবে, আধ্যাত্মিক ভাবে প্রকাশ করতে পারব। এবং তখনি আমরা তাদের থেকে ভিন্ন হতে পারব। আল্লাহ্ তা'লার জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য বহুগুণে বেড়ে যায়। যা অন্য সবার থেকে তাকে আলাদা করে তোলে। রসূলে করীম (সা.)-কে ভালোবেসে আল্লাহ্‌কে পাওয়া যায়। আর সেই সত্তাকে (সা.)কে ভালোবাসতে হবে আগে ভালবাসতে হবে, মানতে হবে তাঁর জামানার ইমামকে। কারণ তাঁর ইমামই তাঁকে ভালোবাসতে শিক্ষাদান করেন। এইসব বিষয়াবলী একজন আহমদী মুসলমান হিসেবে অন্য নামধারী মুসলমানদের বুঝানো তাদের জানানো আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য। তা না হলে আল্লাহ্‌র কাছে সত্য জামা'তে দাখিল হবার পরেও জিজ্ঞাসিত হতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীকে তাদের দায়িত্ব কর্তব্য বুঝার ও তা অনুসারে আমল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

আবু সালেহ আহমদ, ঢাকা

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাঠকদের অংশগ্রহণে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে 'পাঠক কলাম'। আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"ইসলামে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার।"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ১৫ নভেম্বর, ২০১৫-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। আত্মসংশোধনে হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবার প্রভাব।

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

বিঃ দ্রঃ পাঠকরা যদি কোন বিষয় নিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঠক কলামে লিখতে চান তাও পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

ন্যাশনাল সেক্রেটারী, ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com

সংবাদ

নারায়ণগঞ্জ জামা'তে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নারায়ণগঞ্জ-এর উদ্যোগে গত ১১-০৯-২০১৫ বাদ জুমুআ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অত্যন্ত সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন সিকদার সানী আহমদ এবং উর্দু নযম পেশ করেন আদিল আহমদ খন্দকার। "সহিষ্ণুতায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)" এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা নাবিদুর রহমান। এরপর 'বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অতুলনীয় মর্যাদা' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মুহাম্মদ সোলায়মান। এরপর প্রধান অতিথি মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, বাংলাদেশ। তার বক্তব্যে তিনি আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) এর অতুলনীয় জীবনের কয়েকটি ঘটনা চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করেন। শেষে সভাপতি জনাব মোস্তফা পাটোয়ারী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নারায়ণগঞ্জ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের শেষে ভাগে ১ ঘন্টা প্রানবন্ত প্রশ্নোত্তর পর্বে আহমদী ও অ-আহমদীরা বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। এমটিএ-তে হুযূরের সরাসরি খোতবা শেষ হলে, ৫ জন জেরে তবলীগ মেহমান উৎসাহিত হয়ে আবারও প্রশ্নোত্তরে বসেন। উক্ত সীরাতুন নবী (সা.) জলসায় মোট ১৮৯ জন উপস্থিত ছিলেন। সীরাতুন নবী (সা.) জলসার শেষে স্থানীয় আমীর দোয়া পরিচালনা করেন।

ডাঃ মোজাফফর উদ্দিন আহমদ

তবলীগি সভা ও সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আয়োজনে গত ০৭/০৮/২০১৫ তারিখ বাদ আসর মৌড়াইল হালকা নামায সেন্টারে এক তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এছাড়া গত ২৯/০৮/২০১৫ তারিখ বাদ মাগরিব দক্ষিণ আহমদী পাড়ায় আলহাজ্জ জায়েদ আহমদ সাহেবের বাসায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

মোহাম্মদ আবু তালেব

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে বিশেষ বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে গত ১৩ই সেপ্টেম্বর ২০১৫ রোজ রবিবার বাদ আসর স্থানীয় কবরস্থানে এক বিশেষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালন করা হয়। এতে প্রথমেই একটি বনজ বৃক্ষরোপণ করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ। এরপর পর্যায়ক্রমে বৃক্ষরোপণ করেন জনাব ইমতিয়াজ আলী, এখতিয়ার উদ্দিন শুভ। মওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম ও স্থানীয় জামা'তের কর্মকর্তাগণ। বৃক্ষরোপণ শেষে এর ফজিলত বর্ণনা করেন ও দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম মোবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব।

নায়েমে ওয়াকারে আমল

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্তৃক ৪৬তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা সফলতার সাথে সমাপ্ত

গত ১০ এবং ১১ই সেপ্টেম্বর রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে ৪৬তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব সদর সাহেবের প্রতিনিধি জনাব জাহেদ আলীর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব তৌফিক সরকার, উর্দু নযম পেশ করেন জনাব কাউসার আহমদ মঞ্জুর। এরপর সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার পর স্বাগত ভাষণ দেন জনাব এখতিয়ার উদ্দিন শুভ। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, আমীর ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও জনাব শেখ সাব্বির আহমদ, জেলা কায়েদ। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে বাজামা'ত তাহাজ্জুদ নামায অনুষ্ঠিত হয়, এতে ৮২ জন খাদেম, আতফাল সহ মোট ৮৭ জন অংশে নেন। ১১ সেপ্টেম্বর বাদ ফজর হতে খোদ্দাম এবং আতফালের ৩টি গ্রুপে বিভিন্ন তালিমী ও খেলাধূলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৩টায় সদর সাহেবের প্রতিনিধির সভাপতিত্বে সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী হয়। পরিশেষে আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এ ইজতেমায় মোট ১০৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

মোহাম্মদ আশরাফ

সীরাতুন নবী (সা.) জলসা ও তরবিয়তী প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠিত

গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী জামালপুর (হবিগঞ্জ) জামা'তে সীরাতুননবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শেষে একঘন্টা প্রশ্নোত্তর আলোচনায় আগত ৫৫ জন আহমদী ও ১০ জন মেহমানসহ প্রশ্নোত্তর অধিবেশনে অংশ নেন।

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া টু শালগাঁও হাইকিং কর্মসূচী বাস্তবায়ণ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ রোজ রবিবার শালগাঁও জামা'তের উদ্দেশ্যে একটি মনোমুগ্ধকর হাইকিং কর্মসূচী পালিত হয়। এ-দিবসের বাদ ফজর (সকাল ৫-৪৫ মি.) খোদ্দাম অফিস কক্ষে দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হতে পায়ে হেঁটে হাইকিং (পল্লী অঞ্চলে পায়ে হেঁটে চলা) কর্মসূচীর আরম্ভ হয়। দোয়া পরিচালনা করেন মৌ. এস, এম আবু তাহের। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মজলিসের সফরকারি বাহিনী শালগাঁও মসজিদে পৌঁছলে টিমকে স্বাগত জানান আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, শালগাঁও এর প্রেসিডেন্ট জনাব বশির মিয়া, কায়েদ জনাব হাদিস মিয়া ও জামা'তের বুযুর্গ আনসার ও খোদ্দামরা। উনারা আনন্দ ও উৎসাহ নিয়ে আমাদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন ও অভ্যর্থনা জানান। এরপর মসজিদে ক্ষণিক বিশ্রামের পর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও কুশল বিনিময় হয়। স্থানীয় জামা'তের সদস্যরা এই সফরের সময় খুবই খুশি হন। হাইকিং সফরে অত্র মজলিসের ২৪ জন খোদ্দাম/আতফাল অংশগ্রহণ করেন।

নাযেম সেহতে জিসমানি

সীরাতুন নবী (সা.) জলসা

গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ বাদ আসর মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরীর উপস্থিতিতে এক মনোজ্ঞ ও সুন্দর সীরাতুন নবী (সা.) জলসা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৮২ জন খোদ্দাম আতফালসহ মোট ১৯৯ জন উপস্থিত ছিলেন। প্রোগ্রাম ১০ জন অ-আহমদীর উপস্থিতিতে একটি আকর্ষণীয় প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

নাযেম তবলীগ

সীরাতুন নবী (সা.) জলসা ও প্রশ্নোত্তর সেমিনার

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, দূর্গারামপুরে গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ রোজ রবিবার বাদ আসর হতে রাত ১০টা পর্যন্ত সীরাতুন নবী (সা.) জলসা ও প্রশ্নোত্তর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব তৌফিক-ই-ইলাহী, কুরআন তেলাওয়াত করেন মেহেদী সোলায়মান এবং আরবী কাসিদা পাঠ করেন আফজাল আহমদ (ইয়াছিন)। এপর বক্তৃতা-পর্ব শুরু হয়। শুরুতেই "উত্তম চরিত্র ও ইবাদতে হযরত রসূল করীম (সা.)" এই বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন মৌ. দেলোয়ার হোসেন। "বিশ্ব শান্তিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)"-এ বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন মৌ. আবু তাহের। এরপর যৌথভাবে বাংলা নযম পরিবেশন করেন হৃদয় মিয়া ও সাজিদুল ইসলাম। 'সীরাতুন নবী (সা.) কি এবং কেন?' এই বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব এস, এম, হাবিব উল্লাহ্। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হয়। অনুষ্ঠানে মোট ৪১ জন উপস্থিত ছিলেন।

ডা: শরীয়ত উল্লাহ্

লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেজগাঁও-এর বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২২ আগষ্ট ২০১৫ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেজগাঁও-এর উদ্যোগে স্থানীয় জামে মসজিদে দিনব্যাপী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন সদর লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ-এর সম্মানিত প্রতিনিধি আমাতুল কাইয়ূম, নায়েব সদর-১, লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ। সভানেত্রী ছিলেন শারমিন আক্তার শিখা, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, তেজগাঁও। ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে এবং উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন আলহাজ্জ কায়সার আলম, জেনারেল সেক্রেটারী, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেজগাঁও। ইজতেমায় বিভিন্ন বক্তাগণ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও আহমদীয়াতের যুগ খলীফাগণের নসিহতমালা তুলে ধরেন। ইজতেমায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা নেওয়া হয়। সমাপ্তি অধিবেশন দোয়া ও পুরস্কার বিতরণীর মাধ্যমে শেষ হয়।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৫ অনুষ্ঠিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ রোজ শনিবার আন্ত:হালকা ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৫ স্থানীয় নিয়াজ মোহাম্মদ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৩ ঘটিকায় মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ কর্তৃক দোয়া পরিচালনার পর স্থানীয় কায়েদ জনাব এখতিয়ার উদ্দিন শুভ খেলার উদ্বোধন করেন। এই ফুটবল টুর্নামেন্ট-এ উত্তর আহমদী পাড়া, দক্ষিণ আহমদী পাড়া ও মৌড়াইল হালকার পক্ষ থেকে আলাদা আলাদা টিম অংশগ্রহণ করে, তন্মধ্যে উত্তর আহমদী পাড়া দুটি টিম গঠন করে। এই খেলায় বিজয়ী মৌড়াইল ও উত্তর আহমদী পাড়া-১ এর ফাইনাল খেলা হয়। শেষ অবধি খেলাটি ড্র অবস্থায় শেষ হয়। খেলায় ৩টি হালকার ৪৪ জন খাদেম ও বড় আতফাল অংশ নেন।

নাযেম সেহতে জিসমানি

নেত্রকোনা ও কলমাকান্দার হরিণাকুঁড়িতে তবলীগ ও তালিম-তরবিয়তী সভা

গত ২৬/০৯/২০১৫ তারিখে নেত্রকোনা ও কলমাকান্দার হরিণাকুঁড়িতে তবলীগ ও তালিম-তরবিয়তী বিষয়ক নসীহত-মূলক আলোচনা করা হয়। এতে আহমদীদেরকে একত্রিত করে নামায, চাঁদা এবং তবলিগী বিষয়ে আলোচনা করা হয়। তরবিয়তীমূলক এই সফরে মওলানা রবিউল ইসলাম, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ জনাব তাসাদ্দক হোসেন এবং খাকসারসহ আরো কয়েকজন অংশ নেন।

মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ্ আসাদ

সন্তান লাভ

গত ০৯-০৯-২০১৫ইং রোজ বুধবার সন্ধ্যা ৭-০০ ঘটিকায় বীরপাইকশাস্থ মোহাম্মদ জহিরুল হক (রাহিদ) ও রেহেনা আক্তার (পুতুল) এক পুত্র-সন্তান লাভ করেন, আলহামদুলিল্লাহ্! নবাগতের দ্বীন-দুনিয়ার কামিয়াবীর জন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নির নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মদ হাবিবুল হক (খোকা), দাদা
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বীরপাইকশা

শুভ বিবাহ

চট্টগ্রাম জামা'তের সদস্য মরহুম আসগর আহমদ সাহেবের একমাত্র পুত্র আসফাক আহমদ সামী-এর সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত মাহবুব হোসেন সাহেবের দ্বিতীয় কন্যা আলিয়া রিফফাত মুনা-এর বিবাহ ৭,২০,০০০/- (সাত লক্ষ বিশ হাজার) টাকা দেন মোহরানায় গত ১৪ অক্টোবর ২০১৫ রোজ বুধবার বাদ মাগরিব চকবাজার মসজিদে সম্পন্ন হয়। জামা'তের সকল ভাই বোনের নিকট নব দম্পতির জন্য দোয়ার আবেদন করা হল।

গত ২৮/০৮/২০১৫ ইং তারিখে সিলিমা সুবহা প্রিমা-পিতা ইঞ্জিনিয়ার এম, এ, কাশেম, খুলশী, চট্টগ্রাম এর সাথে আতাউল কাইয়ুম চৌধুরী (রাজ) M.B.A CARDIFF UNIVERSITY U.K. পিতা-বাবুল আহমদ চৌধুরী (Deputy Commissioner of Taxes, N.B.R Dhaka) -এর বিবাহ চট্টগ্রাম আহমদীয়া মসজিদে ৫,০০,০০০/- (পাঁচলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

বিয়ে পড়ান চট্টগ্রাম মসজিদের ইমাম মওলানা জাফর আহমদ। বিয়ের রেজি নং ২৭৫/১৫। উক্ত বিয়ে আল্লাহ্ তা'লা যেন বরকতময় করেন, তার জন্য সকল আহমদী ভাই বোনদের নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, আতাউল কাইয়ুম চৌধুরী তদানিন্তন ভারতবর্ষের (বর্তমান বাংলাদেশ) ১৯১২ইং সালের Pioneer আহমদীদের মধ্যে অন্যতম মরহুম মৌলভী এমদাদ আলী চৌধুরীর (পুনিয়াউট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া) একমাত্র প্রপৌত্র।

বাবুল আহমদ চৌধুরী ও
মিসেস হামিদা বেগম, উত্তরা, ঢাকা

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত ২৩ অক্টোবর, ২০১৫ জুমুআর খুতবার সারমর্ম

হুযূর আনোয়ার (আই.) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত এ সপ্তাহের খুতবায় বলেন, সম্প্রতি হল্যান্ড এবং জার্মানী সফরের সুযোগ ঘটে আর বরাবরের মতো এই সফরেও আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহ ও কৃপারাজি ব্যাপকহারে বর্ষিত হতে দেখেছি এরফলে আমরা যতই খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না কেন তা হবে অপ্রতুল।

হুযূর বলেন, অনেক সময় জামা'তের পক্ষ থেকে অ-আহমদীদের নিয়ে এমন এমন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসব অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রচারও হয় ফলে চিন্তা হয় যে, জামা'ত বিরোধী কোন অনিষ্ট শক্তি আবার অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে অথবা অনুষ্ঠানের মান যথাযথ না হলে আবার লজ্জায় না পড়তে হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং নিজ করুণায় আমাদের এসব উদ্যোগ সফল করেন।

যেমন হল্যান্ড জামা'ত সেখানকার সংসদে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল এতে জামা'তের কোন হাত নেই বরং অদৃশ্য হতে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লাই যেন পুরো অনুষ্ঠানকে সফল করার ব্যবস্থা করেছেন।

জার্মানী জামা'ত অনেক বড় আর সেখানে জামা'তের নাম-ডাক আর পরিচিতিও আছে কিন্তু হল্যান্ড জামা'ত এমনিতেই ছোট্ট একটি জামা'ত আর তাদের দেশের উপর মহলেও খুব একটা পরিচিতি নেই। কিন্তু তারপরও কীভাবে এতবড় এবং এত সফল একটি অনুষ্ঠান হলো তা ভেবে অবাক হতে হয়। এসবই খোদার কৃপায় হয়েছে। জার্মানী জামা'তের এত অভিজ্ঞতা এবং ব্যাপক পরিচিতি থাকা সত্ত্বেও তারা এখনো এ ধরনের অনুষ্ঠান করতে পারেনি। যাহোক, এই অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য হল্যান্ড জামা'ত সর্বক্ষেত্রে যোগাযোগের যে ধারা সৃষ্টি করেছে তা বহাল রাখতে হবে এবং এর গন্ডিকে আরো প্রসারিত করতে হবে।

হুযূর বলেন, আমাদের নুনস্পিট এলাকার সাংসদ যিনি সংসদে পররাষ্ট্র মন্ত্রণায় কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, তিনি সংসদ ভবনের একটি কক্ষে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করেন। আমি ধারণা করেছিলাম, খুব বেশি একটা লোক আসবে না কারণ সেখানে জামা'তের খুব একটা পরিচিতি নেই। কিন্তু আল্লাহ্‌র কৃপায় এই অনুষ্ঠানে ৮৯জন উর্দ্ধতন কর্মকর্তা যোগদান করেন যাদের মধ্যে ডেনিশ সংসদের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও স্পেন, আয়ারল্যান্ড, সুইডেন, ক্রোয়েশিয়া, মন্টিনেগ্রো, আলবেনিয়া, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়াম, জার্মানী, ইন্ডিয়া, ফিলিপাইন, ডেনমার্ক এবং সাইপ্রাস হতে বিভিন্ন সংসদ সদস্য, রাষ্টদূত, সরকারী কর্মকর্তা এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

হুযূর বলেন, এই অনুষ্ঠানে আমি ইসলামী শিক্ষা এবং চলমান সংকট সমাধানের নিরিখে সংক্ষেপে কিছু কথা বলেছি। এখানে বিভিন্ন দলের কয়েকজন সাংসদ আমাকে এমন এমন প্রশ্ন করেন যে, মনে হচ্ছিল তারা আমাকে দিয়ে বলাতে চাচ্ছে, ইসলামের শিক্ষা ভুল অথবা আমার মুখ থেকে এমন কোন কথা বের করার চেষ্টা হয় যদ্বারা তারা ইসলামের ওপর আক্রমন করতে পারে। অন্যান্য দেশ থেকে আগত সাংসদরাও বিষয়টি অনুধাবন করেছেন এবং একান্ত স্বাক্ষাতকারে এজন্য লজ্জাও প্রকাশ করেছেন। এমনকি সেখানে উপস্থিত ডেনিশ লোকেরাও তাদের এরূপ আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। অনেকে মনে করে, তারা হয়তো আমাকে রাগানোর চেষ্টা করেছে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অনেক বেশি ধৈর্যশক্তি দিয়েছেন।

তাদের মধ্য হতেই একজন ছবি তোলার সময় আমাকে বলেছে, যদি আমার প্রশ্ন সঠিক না হয়ে থাকে তাহলে আমি এজন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

এরপর হুযূর একে একে এসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকদের ওপর তাঁর বক্তৃতা, উত্তর এবং ব্যবহারের কীরূপ ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে তা বর্ণনা করেন। তারা এধরনের আরো অনুষ্ঠান করার এবং সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে জানার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। জামা'তে আহমদীয়ার এরূপ উদ্যোগকে তারা সাধুবাদ জানান এবং সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা জানতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করেন। তারা মনে করেন, এই অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে আর এর সুদূর প্রসারী ফলাফল প্রকাশ পাবে। ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষামালা মনোরমভাবে তুলে ধরার জন্য তারা আমাকে ধন্যবাদ জানান।

এছাড়া 'আলমেরা' শহরে হল্যান্ড জামা'তের প্রথম মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর রাখা হয় এই সফরে। আর এর সংবাদ ফলাও করে রেডিও, টিভি ও সংবাদ পত্রে প্রচার করা হয় যার মাধ্যমে দেশের একটি বিশাল জনগোষ্ঠির কাছে জামা'তের বার্তা এবং ইসলামী শিক্ষা পৌঁছানোর সুযোগ হয়েছে।

এরপর জার্মানীতে ২টি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। সেসব অনুষ্ঠানেও আল্লাহ্‌র ফযলে স্থানীয় প্রশাসন ও বাসিন্দাদের একটি বড় অংশ উপস্থিত হয়েছেন এবং মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কথা জেনে তারা আনন্দিত হয়েছেন আর অনেকের মনে ইসলাম এবং মসজিদ সম্পর্কে যে ভীতি ছিল তাও দূর হয়েছে।

আল্লাহ্‌র ফযলে দু'দশের এই সফরে বিভিন্ন রেডিও, টিভি এবং পত্র-পত্রিকার সাথে একান্ত সাক্ষাৎকার প্রদানেরও সুযোগ ঘটে আর এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছানোর সুযোগ হয়েছে।

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

7th October 2015
PRESS RELEASE

Head of Ahmadiyya Muslim Community delivers historic address at Dutch National Parliament

Hazrat Mirza Masroor Ahmad says Islam guarantees universal freedom of religion and calls for world powers to act with justice

On 6 October 2015, World Head of the Ahmadiyya Muslim Community, the Fifth Khalifa (Caliph), His Holiness, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, delivered an historic address at a special session of the Standing Committee for Foreign Affairs at the Netherlands National Parliament in the country's capital city of Den Haag (The Hague) in front of an audience of more than 100 dignitaries and guests.

Upon arrival at 4.35pm, Hazrat Mirza Masroor Ahmad was greeted by Harry van Bommel (Member of the House of Representatives and Deputy Chairman of the Standing Committee for Foreign Affairs), who escorted His Holiness to the Committee Room.

The formal session commenced as Mr van Bommel welcomed His Holiness to Parliament and introduced the committee members.

He also welcomed various foreign Parliamentarians, Ambassadors of State anddignitaries representing countries including Albania, Croatia, Ireland, Montenegro, Spain and Sweden.

Thereafter, Hazrat Mirza Masroor Ahmad delivered the keynote address during which he deemed the threat to the world's peace and security to be the critical issue of this era.

His Holiness gave solutions to the problems faced by the world based on the teachings of the Holy Quran. He also called on world powers to support less economically developed nations and to refrain from exploitation.

Speaking about the increasing lack of peace in the world, Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

"In today's world we see that certain issues are constantly being highlighted and labelled as the most significant

problems of our time. If we analyse the situation objectively, we realise that world peace and security is indeed the most critical issue of our time. Unquestionably, with each day that passes the world is becoming increasingly unstable and dangerous and there are a number of potential causes of this."

His Holiness said there were various factors affecting the world's peace and security, including worldwide economic instability; a lack of justice and trust between governments and members of the public; and the increasing discrepancy between developed and developing nations.

The religious leader said that neither Islam, nor any other religion, could be blamed for the violent acts of extremists.

His Holiness stated that the notion that the Holy Quran or the Prophet of Islam (peace be upon him) ever advocated any form of extremism or terrorism was "an injustice of the very highest order".

Referring to the Ahmadiyya Muslim Community's unwavering commitment to peace, Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

"I, and indeed all true Ahmadi Muslims, are not amongst those people who are creating or partaking in today's disorder and unrest. Rather, we are the people who desire peace in the world. We are the people who seek to heal the world. We are the people who seek to unite mankind. We are the people who seek to transform all hatreds and enmities into love and affection. And most certainly, we are the people who make every possible effort towards establishing world peace."

Hazrat Mirza Masroor Ahmad continued:

"As a religious leader, I wish to say that instead of blaming and provoking one another, we should focus upon building true and long-lasting world peace."

Later, Hazrat Mirza Masroor Ahmad cited a number of Quranic verses, which proved that Islam stood for religious freedom and universal human rights.

His Holiness also explained that the wars fought by the Holy Prophet (peace be upon him) and the early Muslims were entirely defensive in nature and were fought in order to protect the principles of freedom of religion and belief.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

"In chapter 2, verse 194, Allah has commanded Muslims that they are not permitted to engage in any battle or war where religious freedom already exists. Therefore, no Muslim country, group or individual has the right to engage in any form of violence, warfare or lawlessness, either against the State or its people."

Hazrat Mirza Masroor Ahmad continued:

"Quite simply, in Europe and in the West, the governments are secular and so a Muslim can never have the right to violate the laws of the land, to violently oppose the government or to instigate any form of rebellion or insurgency."

Speaking about the paramount importance of justice in international relations, Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

"Islam teaches that in all circumstances, no matter how difficult, you must remain firmly attached to the principles of justice and integrity… The truth is that sustainable peace can never be established until there is justice at every level of society."

Referring to Islam's commitment to universal religious freedom, Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

"In truth, Islam guarantees the freedom, liberty and protection of the people of all religions. Islam protects the right of every individual to follow his or her own chosen path or belief."

Reiterating his concern about the world's security, Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

"The world stands in desperate need of peace and security. This is the urgent issue of our time. All nations and all peoples must come together for the greater good and unite in their efforts to stop all forms of cruelty, persecution and injustice perpetrated in the name of religion or in any other way. This includes the mockery of any religion which can incite frustrations and resentment and of course also includes the hateful activities of extremist groups who are falsely justifying their evil acts in the name of religion."

Concluding, His Holiness called on the major powers to desist from all forms of exploitation of weaker nations.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

"Today, we are seeing many first-world countries increasing their investments in the poorer and developing nations. It is imperative that they act with justice and seek to help those nations and not merely utilise their natural resources and cheap labour forces for their own national gains and profit-making."

Hazrat Mirza Masroor Ahmad continued:

"They (affluent nations) should seek to re-invest the majority of what they earn in poorer countries and use the wealth to help the local people develop and to flourish. If the developed countries act in this way, it will not just be of benefit to the poorer nations but will prove mutually beneficial. It will increase trust and confidence and remove frustrations that are building up. it will be a means of improving the local economies and so in turn will elevate the world's economy and financial health."

Following the conclusion of his address, members of the Standing Committee were given the opportunity to ask His Holiness his views on a range of issues, including religious freedom, freedom of speech, the refugee crisis and the persecution of the Ahmadiyya Muslim Community.

Later, His Holiness personally met various dignitaries and guests and was also given a tour of certain historic rooms within the Parliament.

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২ অক্টোবর, ২০১৫ ইং, রোজ শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে জুমুআর খুতবায় নিম্নোক্ত তিনটি দোয়া বেশি বেশি পড়ার প্রতি জামা'তের সকল সদস্যকে নসীহত প্রদান করেন।

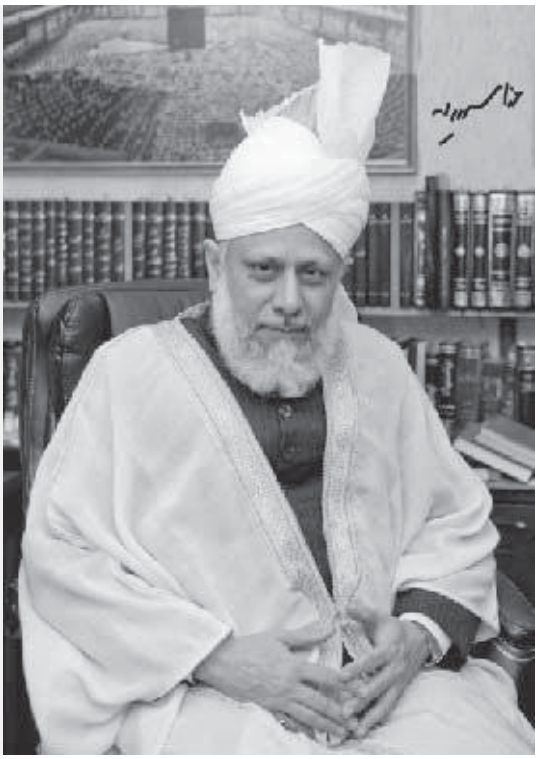

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার।"

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান কর এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

*** এছাড়া হুযূর (আই.) ইস্তেগফার করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।**

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّ اَتُوْبُ اِلَيْهِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ : আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ
رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী।"

অর্থ : হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ
وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ : হে আমার আল্লাহ্! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

N AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola
Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road
Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road
Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয়

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্ব প্রথম ফল পাবেন। (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন। (৩) উচ্চ রক্তচাপ-(Hipertension) ১ মাস। (৪) বহুমুত্র (Diabetes) ১ মাস। (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis) ৩ মাস। (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases) ৩ মাস। (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland) ৩ মাস। (৮) কর্কট রোগ (Cancer) প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস। (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাত রাস, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ্য চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"দিল মেঁ য়্যাহী হ্যা হার্দাম তেরা সাহীফা চুমুঁ
কুরআঁ কে গিরদ্ ঘুমুঁ কা'বা মেরা য়্যাহী হ্যা"

আমার আন্তরিক বাসনা হলো, সর্বদা যেন তোমার কিতাব চুম্বন করি আর কুরআনের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করি; বস্তুত আমার কা'বা এটাই।
–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী উপলক্ষে বহু প্রতিক্ষিত শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে।

এটি ইতিহাস ও তথ্যের এক অতুলনীয় সন্নিবেশ। এতে হুযূর আকদাস (আই.)-এর শতবার্ষিকী উপলক্ষে ঐতিহাসিক ভাষণ এবং স্মরণিকার জন্য হুযূর আকদাসের বিশেষ বাণী রয়েছে।

এতে আরো রয়েছে, এই বাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি থেকে পথচলার দুর্লভ ইতিহাস। রয়েছে বাংলাদেশের সকল মসজিদ ও মিশনের সচিত্র একটি সংগ্রহ। এছাড়াও এতে এমন কিছু তথ্য রয়েছে যা ইতিপূর্বে কখনও সামনে আসে নি। এতে রয়েছে, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এছাড়াও রয়েছে ঈমান উদ্দীপক ও ইতিহাস সম্বলিত অনেক প্রবন্ধ। দু'শত বত্রিশ পৃষ্ঠার এই স্মরণিকায় আরো এমন বিষয় রয়েছে যা সত্যিই সংগ্রহ করে রাখার মত। তাই যত শিঘ্র সম্ভব আপনার কপিটি বাংলাদেশের ইশায়াত বিভাগে যোগাযোগ করে সংগ্রহ করুন।

স্মরণিকাটির শুভেচ্ছা মূল্য ৩০০/- (তিন শত) টাকা। প্রয়োজনে : ০১৭৩৬ ১২৪৭০৪

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com